আলোরপথ
১১তম সংখ্যা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, ২৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন

কুরআনের আলোকে রামাদ্বান

রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল-এর ফজিলত

আলোরপথ

১১তম সংখ্যা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
২৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
মোসলেহ ফারাদী
নুরুল মতিন চৌধুরী
মোসাদ্দেক আহমেদ
ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী

সম্পাদক
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী
ড. মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন
মোস্তাকিম প্রামানিক
আবু ইহসান
মুজাম্মেল হোসেন তুহিন
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান
ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা
ড. মুহাম্মদ এহসানুল হক
মুহাম্মাদ মোস্তফা জামিল

পাবলিকেশন্স সহযোগী
জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কনসেপ্ট ডিজাইন
conceptdesign1971@gmail.com

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি : ২০২৫

প্রকাশনায়
MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ	৪
কুরআনের আলোকে রামাদ্বান মোসলেহ ফারাদী	৯
রামাদ্বান, রোজা ও দু'আ শায়খ আবদুল কাইয়ুম	১২
রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল-এর ফজিলত মুহাম্মদ আবুল হোসাইন খান	১৫
রোজা : তাক্বওয়া ও প্রকৃত জ্ঞান ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা	২৩
আল কুরআন, রামাদ্বান ও মানবজীবনে রোজার শিক্ষা আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	২৫
রামাদ্বানে উপবাস : চিকিৎসা গবেষণা ও স্বাস্থ্য উপকারিতা ড. মোহাম্মদ আমিন	৪০
মুসলিম জীবনে সওমের সফলতা ফিরোজ মাহবুব কামাল	৪৪
অনুকূল সময়ের পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হই আলী আহমাদ মাবরুর	৫৩
রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস এনামুল করীম ইমাম	৫৬
মুসলমানদের সোনালী অতীত (৫ম পর্ব) আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ	৫৮
পবিত্র মাহে রামাদ্বান উপলক্ষ্যে মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতির আহ্বান	৬৩
সংগঠন সংবাদ	৬৫

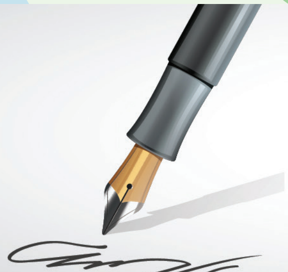

সম্পাদকীয়

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।”

(সুরা আল-বাকারা : ১৮৩)

আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়ায় মস্তক অবনত করছি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আসমান জমিনের একক অধিপতি আমাদের মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক ও আমাদের প্রিয় রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতি। স্মরণ করছি বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী মর্দে মুজাহিদসহ আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সাহাবাদের।

আজ আমরা এমন একটি সময়ে উপনিত হয়েছি, যখন এই সময়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে এই মর্মে– “আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রামাদ্বান” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে (হায়াত) রামাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।” আসুন আমরা অনুরূপ দোয়া করছি মহান রবের নিকট। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করুন। আমিন।

উপরিউক্ত আয়াতে রামাদ্বান মাসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার পথে এ নিয়ামতপূর্ণ মোবারক মাস একজন বান্দাহর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার। আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য এ মাসের বিকল্প নেই। অতীতের সকল গুনাহ ও পাপ জ্বলে পুড়ে ছাই করে দিয়ে একজন মুমিন মুসলমান হিসাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার এক অফুরন্ত সুযোগ। এই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত অধিক পরিমাণ রহমত-বরকত নাজিল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার রহমতের দরজা তাঁর মুমিন বান্দাহদের জন্য খুলে যায়। এই প্রেক্ষিতে রাসুল (সা.) বলেছেন, “রামাদ্বান মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত। এটা অতিশয় রহমত-বরকতপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা দেওয়া হয়। এ মাসে বড়ো বড়ো শয়তানদের আটক করে রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকলো, সে মূলত সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকলো” (আহমাদ ও নাসাঈ)। আল্লাহ আমাদের এই সুযোগ গ্রহণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

রামাদ্বান মাস নিয়ে আলোর পথের **১১**তম সংখ্যা সাজানো হয়েছে। রামাদ্বান মাসে আমাদের কী করণীয় হতে শুরু করে কীভাবে এ মাস হতে আমরা সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করব, সে সম্পর্কে লেখকগণ সহজ সরল ভাষায় আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য রামাদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা তাকওয়াবান মানুষ ছাড়া একটি সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একই সাথে সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের শেষ বিজয়ী কারা হবে, তা বদরের দিবস আমাদের স্মরণ করে দেয়।

আলোর পথে লেখা দিয়ে, মূল্যবান সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যারা আমাদের পাশে আছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, এই সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে। ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগে আমাদের অংশগ্রহণ আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন

ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ

কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এটি একটি হেদায়েত বা পথনির্দেশনামূলক গ্রন্থ, যা নিশ্চিতভাবে একজন মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে পারে। আল কুরআন হলো সেই অমূল্য গ্রন্থ যা সঠিক বা ভুল, কিংবা ভালো বা মন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। আসমানি এ গ্রন্থের লেখক এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–"এই কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (সুরা বাকারা : ১৮৫)

কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানুষের জীবনকে ভয় ও দুশ্চিন্তামুক্ত করতে সাহায্য করে। এর লেখক ও আমাদের সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে আরও ঘোষণা করেছেন–"অতঃপর যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার ওপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) সে চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।" (সুরা বাকারা : ৩৮)

আল কুরআন হলো সেই গ্রন্থ যা সফল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর লেখক ও আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এটি নিশ্চিত করে বলেছেন– "এই (কুরআন) হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।" (সুরা আলে ইমরান : ১৩৮)

কুরআন হলো সেই আলো, যা একজন ব্যক্তির পুরো জীবনকে আলোকিত করে এবং অন্ধকার দূর করে, তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কুরআনকে একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন– "এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি– যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য রবের নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (সুরা ইবরাহিম : ১)

সুতরাং, কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ, গতিশীল, নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও আলোকিত করতে সহায়তা করে। এই প্রবন্ধে আমরা একটি কুরআনিক পরিবারের গঠন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন করা

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন করার মানে হলো এমন একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করা, যে পরিবারটি কুরআনের আদর্শ, শিক্ষা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। আল কুরআন এমন একটি পরিবেশ তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেয়, যেখানে ঈমান, ভালোবাসা, সম্মান ও দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়; যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনের

জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা টিপস নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. ঈমানের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো ঈমানের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা। কারণ, কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে যে এটি শুধুমাত্র তাদেরই পথনির্দেশনা দেয়, যাদের ঈমানের ছয়টি মূল বিষয়ের ওপর দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। "এ সেই কিতাব যা নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের রবের পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।" (সুরা বাকারা : ২-৫)

২. সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন

পরিবারের শুরু হয় স্বামী ও স্ত্রীর একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। তাই জীবনসঙ্গীও কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিনা কিংবা আগ্রহী কিনা– একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনের জন্য বিয়ের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।। যদি স্বামী বা স্ত্রী কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনে আন্তরিক না হয়, তবে তার এই প্রচেষ্টা কেবলই স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে, বাস্তবায়িত আর হবে না।

এ কারণে কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনে সফল হতে হলে সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন সম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেছেন– "একজন নারীকে চারটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, বংশীয় মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং তাকওয়া। তবে যদি তাকওয়াবান নারীকে বিবাহ করো, তবে তুমি সফল হবে" (বুখারি ও মুসলিম)। উল্লেখ্য, এই নির্দেশনা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩. কুরআন অনুসরণে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনের জন্য উভয় জীবনসঙ্গীরই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে কুরআনকে পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করবেন। কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উত্তম চরিত্র গঠনে কুরআনকে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বানাবেন। এভাবে, পরিবারের প্রতিটি সদস্য কুরআনের আলোকে জীবনযাপনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে শিখবেন এবং একটি পর্যায়ে পুরো পরিবারটিই কুরআন ভিত্তিক জীবনধারার দিকে ধাবিত হবেন।

সা'দ ইবনে হিশাম (রা.) বললেন, হে উম্মুল মুমিনিন! আপনি আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। আয়েশা (রা.) বললেন, 'তুমি কুরআন পাঠ কর না? সা'দ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। আয়েশা (রা.) বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাব-চরিত্রই ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছবি।" (নাসাঈ : ১৬০১)

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্ত) রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু সে বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। (মুসলিম ৬/৩৩, হাদিস ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৬৫)

৪. তাকওয়া (খোদাভীরুতা) লালন করা

তাকওয়া হল কুরআন থেকে উপকার লাভের পূর্বশর্ত। বিশেষত হিদায়াত লাভের জন্য। আল কুরআন প্রতিটি মানুষের জন্য উন্মুক্ত, তবে এই আসমানি গ্রন্থ শুধুমাত্র তাদেরকেই পথনির্দেশনা দেয় যারা মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু। পবিত্র কুরআন যার কাছ থেকে এসেছে, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "এই (কুরআন) হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।" (সুরা আলে ইমরান : ১৩৮)

অতএব, একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গড়ে তুলতে পরিবারের সকল সদস্যের উচিত তাকওয়ার চেতনাকে লালন করা। এর জন্য নিশ্চিত করতে হবে যে পরিবারে প্রতিটি সিদ্ধান্ত, তা হোক ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতেই যেন গ্রহণ করা হয়।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষা নেওয়া

যেহেতু আমরা আমাদের পরিবারকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে গঠন করতে চাই, তাই আমাদেরকে সঠিক দৃ

ষ্টিভঙ্গি নিয়েই তা শিখতে হবে। কুরআন শেখাকে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রাখতে হবে। আমরা কুরআনের মূল বক্তব্য বোঝার জন্য আরবি শেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের পরিবারের মধ্যে, বিশেষ করে শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কুরআন এবং এর ভাষা শেখার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই, যারা কুরআন শেখে এবং অন্যদের শিক্ষা দেয়" (সহিহ বুখারি)। অতএব, যে পরিবারে কুরআন শেখার এবং শেখানোর সংস্কৃতি রয়েছে, সে পরিবারই প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম পরিবার হিসেবে গণ্য হবে।

৬. কুরআন তিলাওয়াত করা

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গড়ে তুলতে আমাদের পরিবারগুলোতে কুরআনিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিন শুরু করা এবং সকালে কুরআনের একটি অংশ অধ্যয়ন করাকে আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। নিয়মিত কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে পরিবার জ্ঞান ও নূরের দ্বারা আলোকিত হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন যে, "কুরআনের তিলাওয়াত জীবনে রহমত বয়ে আনে।"

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।" (সুরা আরাফ : ২০৪)

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন– "কুরআন তিলাওয়াত করো, কারণ এটি কিয়ামতের দিনে তার সঙ্গীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।" (সহিহ মুসলিম)
তিনি আরও বলেছেন– "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করে, সে একটি নেকি লাভ করে, আর প্রতিটি নেকি দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়।" (সুনান ইবনে মাজাহ)। অতএব, যে পরিবারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেই পরিবার কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

৭. কুরআন অনুধাবন করা

যেহেতু কুরআন আমাদের জীবনের হেদায়েত গ্রন্থ, তাই কুরআন থেকে সর্বোত্তম নির্দেশনা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই এর বিধান ও শিক্ষা সঠিকভাবে বোঝা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয়ই, আমরা কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (সুরা ইউসুফ : ২)

মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং কুরআনের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন। অতএব, দ্বীন আল-ইসলামের বরকত ও কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদের অবশ্যই এই হিদায়াহ (পথনির্দেশনা) গ্রন্থটি সঠিকভাবে বোঝার ও উপলব্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে।

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো এর ভাষা শেখা। দ্বিতীয়ত, আমাদের উচিত প্রতিদিন তাফসিরসহ কুরআন পাঠ করা। তৃতীয়ত, কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন আলেমদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। চতুর্থত, কুরআনের পাঠ চক্রে যোগদান করা। পঞ্চমত, পারিবারিক বৈঠকে কুরআনের অন্তত একটি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, কুরআন বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কুরআনের প্রণেতা মহান আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা। এভাবে উপলব্ধি করতে পারলে কুরআন ভালোভাবে বোঝার প্রেরণা পাওয়া যাবে এবং একইসাথে জীবনযাপনে কুরআনের অনুসরণ করাও সহজ হয়ে যাবে।

৮. কুরআনকে ভালোবাসা

শুধুমাত্র কুরআন পড়া ও বোঝাই যথেষ্ট নয় যদি না আমরা একে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। কুরআনের প্রকৃত উপকারিতা তখনই পাওয়া যাবে যখন আমরা একে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করব। কুরআনের পাঠক যদি কুরআনের প্রতি ভালোবাসা অটুট রাখতে পারে তাহলে এই আসমানি কিতাবটি তার জন্য পথনির্দেশনা, সান্ত্বনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠবে।

আমরা যখন কুরআন পড়ি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই গ্রন্থটি আমাদের প্রিয় প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য উপহার। এটি আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়, শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায়। এটি আমাদের কঠিন সময়ে সহায়তা করে এবং আমাদেরকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত রাখে।

ভালোবাসা সহকারে কুরআন অধ্যায়ন করার মাধ্যমে আমরা অফুরন্ত সওয়াব অর্জন করতে পারি এবং পাশাপাশি আমরা হৃদয়েও শান্তি ও স্বস্তি পাই। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন হলো "একটি জিকিরগ্রন্থ" যা আমাদের মনে আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত রাখে এবং আমাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে,

তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" (সুরা রাদ : ২৮)

৯. কুরআন অনুসরণ করা

কুরআন শুধুমাত্র বুকশেল্ফে সাজিয়ে রাখার জন্য নয়; বরং আল কুরআন আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সফল করার এক অনন্য পথপ্রদর্শক। কুরআন শুরুই হয়েছে একটি দৃঢ় ঘোষণার মধ্য দিয়ে– "এটি (আল কুরআন) আল্লাহর কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই; আল কুরআন আল্লাহভীরুদের জন্য পথ নির্দেশনা।" (সুরা বাকারা : ২)

অতএব, কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো এমন একটি জীবনযাপন শেখানো, যা একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করে তোলে। এটি এমন একটি গ্রন্থ– যা জীবনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ধারণ করে।

কুরআনের শিক্ষা যদি আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এটি অহংকার, অসদাচরণ, পরনিন্দা, লোভ, হিংসা, হত্যা, মদ্যপান, মাদকসেবন, ব্যভিচার, জুয়া ও সামাজিক অসঙ্গতির মতো নেতিবাচক আচরণ নিষিদ্ধ করে। পাশাপাশি, এটি আমাদের ধ্বংসাত্মক অভ্যাস পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদেরকে সংযমী, দয়া নির্ভর, ঐক্যবদ্ধ, বুদ্ধিমান, বিবেচক, শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বস্ত হতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহর আদেশ ও বিধানের প্রতি অনুগত হয়ে জীবনযাপন করার জন্য আল কুরআন আমাদের পথনির্দেশনা প্রদান করে।

মূলত, কুরআন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন অলৌকিক উপহার। এটি এমন এক দিকনির্দেশক, যা জান্নাতের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ও নির্দেশনা ধারণ করে। যারা এই মহাগ্রন্থের সাথে নিজেদের সংযুক্ত রাখে, তারা আল্লাহর সাথেও সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর ভালোবাসা, রহমত ও আত্মিক সমৃদ্ধি অর্জন করে।

কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা, এর আয়াত তিলাওয়াত করা এবং বাস্তব জীবনে এর নির্দেশনা অনুসরণ করাই হলো একটি সুস্থ, সচেতন ও অর্থবহ জীবনযাপনের প্রধান শক্তি। এই অনুশীলনের মাধ্যমেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০. পরিবারে কুরআন ভিত্তিক আচারদি প্রতিষ্ঠা করা

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার জন্য পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং একটি পারিবারিক কাঠামো হিসেবে সম্মিলিতভাবে কুরআনিক আচরাদির অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। কুরআনিক কিছু আচারাদির স্বরূপ হতে পারে এমন–

ক. আল্লাহর নামে প্রতিটি কাজ শুরু ও শেষ করা।
খ. আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও বিধির প্রতি সবসময় সজাগ থাকা।
গ. প্রতিদিন সকালে একটি কুরআনিক আচারাদি (যেমন কুরআন তিলাওয়াত) পালন করা।
ঘ. পরিবারে হাসিমুখে সালাম দেওয়ার সংস্কৃতি বজায় রাখা।
ঙ. শুকর (কৃতজ্ঞতা) ও সবর (ধৈর্য) ধারণের সংস্কৃতি পালন করা।
চ. সালাত-নির্ভর জীবনযাপন করা।
ছ. একে অপরকে ভালোবাসা।
জ. পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা।
ঝ. একে অপরকে ক্ষমা করা।
ঞ. পরস্পরের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়া।
ট. মৃত্যু এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সচেতন থাকা।
ঠ. জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিনয়ী থাকা।
ড. অহেতুক কথা বলা ও সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।
ঢ. অশ্লীল (ফাহিশা) কথা ও আচরণ থেকে বিরত থাকা।
ণ. সততা বজায় রাখা।
ত. বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা।
থ. দানে অভ্যস্ত হওয়া।
দ. জামাআতে সালাত আদায় করা।
ধ. ইসলামিক আচার-ব্যবহার মেনে একসাথে খাওয়া, যেমন হালাল ও হারাম বিষয়ে সতর্ক থাকা।

এই কুরআনিক আচরণগুলো পরিবারে গড়ে তুললে, পরিবারে শান্তি, ঐক্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

১১. দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা

একটি কুরআনিক পরিবার গড়ে তোলার জন্য পরিবারের দুনিয়াবী চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এই অনুভূতিও জাগ্রত করা জরুরি যে প্রকৃত সফলতা আখিরাতেই নিহিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের

একটি সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে আগে পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই দুআ শিখিয়েছেন– "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কীনা আযাবান্নার" ("হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।) একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন করার জন্য এই দুআটি আমাদের নিয়মিত পড়া উচিত।

১২. আল্লাহর সাহায্য চাওয়া

যদিও আমরা অনেক কিছুই করতে পারি, তবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া আমরা কখনোই কুরআন ভিত্তিক পরিবার গড়ে তুলতে পারব না। এজন্য, উপরিউক্ত কাজগুলির পাশাপাশি দুআ হল একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবারের ভিত্তি। তাই, আমাদের উচিত পরিবারের পথনির্দেশনা ও ঐক্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ আমাদের এই সুন্দর দুআটিও শিখিয়েছেন–"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতু আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনি লিল মুত্তাকিনা ইমামা" "হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।" (সুরা ফুরকান : ৭৪)

এই নীতিগুলি মেনে চললে, একজন ব্যক্তি এমন একটি পরিবার গড়ে তুলতে পারবেন যা এই দুনিয়ায় যেমন সফল হবে তেমনি আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতা প্রাপ্তিকেও জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে, ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার অর্থ হলো ঈমান, ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতির একটি অনুপম যাত্রা। কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠনের এই প্রক্রিয়াটি জারি রাখার জন্য কুরআনের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত একটি ভিত্তির প্রয়োজন, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দয়া, এবং ধৈর্যের আলোকেই সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে। এ ধরনের পরিবারগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতি, উন্মুক্ত যোগাযোগ, এবং ইসলামিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে যেখানে ঈমান ও নৈতিক সততাকে লালন করা হয়।

কুরআন একটি ভিত্তিক পরিবার গঠন প্রক্রিয়া নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে, তবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, এবং অবিরাম শিক্ষা অব্যাহত রাখার দিয়ে, একটি কুরআন ভিত্তিক পরিবার শান্তি, শক্তি, এবং দিকনির্দেশনার উৎস হিসেবে সমৃদ্ধ হতে পারে যা আগামী প্রজন্মের জন্য উপকারী হবে। আসুন, আমরা এই নীতিগুলি অনুসরণ করতে চেষ্টা করি যাতে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারি।

একইসাথে, পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাসুল (সা.) এর দিকনির্দেশনাগুলো আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। রাসুল (সা.) বলেছেন, "কুরআন একটি সুপারিশকারী, এবং এর সুপারিশও গ্রহণ করা হয় এবং এর আবেদনের প্রতি বিশ্বাসও স্থাপন করা হয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে তার পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেন, এটি তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, এবং যিনি একে অবজ্ঞা করেন এর পরিণতিতে তাকে জাহান্নামের আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।" (ইবনে হিব্বান : ১২৪)

আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের শব্দগুলো বোঝার ক্ষমতা দান করুন এবং এই মহান গ্রন্থের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন, আমিন। আল্লাহ আমাদের হৃদয় ও মন খুলে দিন যেন আমরা কুরআনের মধ্যে থাকা অমূল্য রত্নগুলো আবিষ্কার করতে পারি এবং এই রত্নগুলোর মাধ্যমে আমাদের পরিবারকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হই, আমিন।

কুরআন শিখুন।
কুরআন পড়ুন।
কুরআন অনুধাবন করুন।
কুরআনকে ভালোবাসুন।
কুরআনকে অনুসরণ করুন এবং
জান্নাতের পথে অগ্রসর হোন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)

কুরআনের আলোকে রামাদ্বান

মোসলেহ ফারাদী

রামাদ্বান শুধু উপবাসের মাস নয়। এ মাসটি এমনই এক পবিত্র সময়, যা আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্যই নির্ধারিত। এই বরকতময় মাসে মানবজাতির জন্য এক ঐশ্বরিক পথপ্রদর্শক হিসেবে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল– যা প্রজ্ঞা ও স্পষ্টতার সাথে সত্যপথকে আরও বেশি স্পষ্ট ও আলোকিত করে।

প্রজ্ঞা ও সত্যনিষ্ঠতার এই গভীর সংযোগ মুমিনদের প্রতি রামাদ্বানের সময় কুরআনের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। বিশেষ করে, রামাদ্বান মাসে তিলাওয়াত, অনুধাবন, চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে কুরআনের সাথে গভীর সংযোগ স্থাপনের জন্য আল কুরআন মুমিনদের তাগিদ দেয়। খোদ রাসুল (সা.) নিজেও এ বিষয়টি দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে গেছেন। রামাদ্বান মাসে নবীজি (সা.) প্রতিবছর ফেরেশতা জিবরাইলের (আ.) সামনে পুরোটা কুরআন পাঠ করতেন এবং রাতের নামাজে দীর্ঘ সুরা তিলাওয়াত করতেন। নবীজি (সা.) এর এই সুন্নাহ অনুসরণ করে মুসলিমরা বিগত ইতিহাসের পুরোটা জুড়েই এই পবিত্র মাসে কুরআন তিলাওয়াত, শ্রবণ করেছেন এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করার চেষ্টা করেছেন।

কুরআন ও রামাদ্বানের মধ্যকার এই নিবিড় সম্পর্ক কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতটিতে অনুধাবন করা যায় যে, রামাদ্বান শুধু রোজার মাস নয়, বরং এটি হলো সেই পবিত্র সময় যখন আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ বলেন– "রামাদ্বান মাস হলো সেই মাস, যাতে মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সঠিক পথের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সুরা আল-বাকারা : ১৮৫)

প্রথম ওহি রামাদ্বানের সময় একটি "বরকতময় রাতে" নাজিল হয়েছিল– "আমরা এটি (কুরআন) একটি বরকতময় রাতে নাজিল করেছি।" (সুরা আদ-দুখান : ৩)

এ কারণে, রামাদ্বানকে কুরআনের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাস হিসেবে পালন করা উচিত। এই মাসটি করুণা, চিন্তাশীলতা এবং আল্লাহর ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং রামাদ্বান

প্রতিবছর রামাদ্বানে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতেন এবং তাঁর সাথে কুরআনের নাজিলকৃত অংশগুলো পুনঃপাঠ করতেন। তাঁর ইন্তেকালের বছরে নবী (সা.) পুরো কুরআন দুইবার

তিলাওয়াত করেছিলেন (বুখারি)। এই বিষয়টি রামাদ্বানে কুরআন অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনার গুরুত্ব তুলে ধরে।

কুরআনের সাথে নবীজি (সা.) এর সম্পৃক্ততার উদাহরণ তাঁর রাতের নামাজেও (কিয়ামুল লাইল) পাওয়া যায়, যেখানে তিনি এক রাকাতে আল-বাকারা, আন-নিসা, এবং আলে-ইমরান সুরার মতো দীর্ঘ সুরা তিলাওয়াত করতেন। তিনি আল্লাহর রহমত ও করুণা সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে থেমে থেমে আল্লাহর করুণা চাইতেন এবং শাস্তির আয়াতগুলোতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। (আহমাদ)

প্রথম যুগের মানুষের কুরআনের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা

প্রথম যুগের মুসলিমরা রামাদ্বানে কুরআনের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। ইমাম আজ-জুহরি বলেছিলেন, "কুরআন তিলাওয়াত এবং দরিদ্রদের আহার করানোর জন্য উপযুক্ত সময় হলো রামাদ্বান।" ইমাম মালিক (রহ.) এবং সুফিয়ান আস-সাওরি (রহ.) রামাদ্বান মাস এলে তাদের সকল জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতেই মনোনিবেশ করতেন।

উমর (রা.) এর খেলাফতের সময়, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এবং তামিম আদ-দারি (রা.) রামাদ্বান মাসে তারাবিহ'র নামাজে ইমামতি করতেন এবং প্রতি রাকাআতে সর্বোচ্চ ২০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। জামাআত এতটাই দীর্ঘ হতো যে লোকজন লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং প্রায় ভোরের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে তাদের নামাজ শেষ হতো।

কাতাদাহসহ আরও বেশ কয়েকজন স্কলারের কথা জানা যায় যারা বছরের অন্যান্য সময়েও প্রতি সাত দিনে একবার, রামাদ্বানে প্রতি তিন দিনে একবার, এবং শেষ দশ রাতে প্রতিদিন একবার কুরআন শেষ করতেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রামাদ্বানে ৬০ বার সম্পূর্ণ কুরআন খতম দিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।

তারাবিহ ও কুরআন তেলাওয়াত

নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রামাদ্বানে ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশায় কিয়াম (তারাবিহ/তাহাজ্জুদ) আদায় করবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

তারাবিহ বা কিয়ামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত। এই সম্মিলিত ইবাদত রামাদ্বানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা মুসলিমদের কুরআন শোনার এবং তা নিয়ে ভাবার সুযোগ করে দেয়। তারাবিহ'র নামাজে ইমাম পুরো মাসে অন্তত একবার কুরআনের সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করার চেষ্টা করেন, যা তারাবিহকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ একটি ইবাদতের রূপ দেয়। তবে চিন্তাভাবনা না করে কেবল একনাগাড়ে শুনে গেলে এই আমলের পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না।

কুরআন তিলাওয়াতের পুরস্কার

রামাদ্বানে কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে অগণিত পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে, এবং প্রতিটি পুরস্কার দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। এক্ষেত্রে 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর নয়; বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর, এবং 'মীম' একটি অক্ষর।" (তিরমিজি)

যারা ঠেকে ঠেকে বা কষ্ট করে তিলাওয়াত করেন তাদের জন্য নবী (সা.) এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ, সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে তিলাওয়াত করে এবং এ জন্য পরিশ্রম করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদিস এই মর্মে উৎসাহিত করে যে, দক্ষতা না থাকলেও কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ তিলাওয়াতের যে কোনো প্রচেষ্টার প্রতিদান হিসেবে বড়ো সওয়াব প্রদান করা হবে। তাই তিলাওয়াতে দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা আছে– এ অজুহাতে তিলাওয়াত থেকে দূরে থাকা যাবে না।

রামাদ্বানে কুরআনের সাথে সম্পর্ক

১. প্রচুর তিলাওয়াত

বেশি বেশি নেকি হাসিল করার উদ্দেশ্যে রামাদ্বানে সর্বোচ্চবার কুরআন খতম করার জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. প্রতিফলন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

ছোট ছোট অংশ তিলাওয়াত করে তার অর্থ অধ্যয়ন করা এবং দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

৩. হিফজ ও পুনঃপাঠ

কুরআনের কিছু অংশ হিফজ করা এবং তা পুনঃপাঠ করার জন্য সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে। নবী (সা.) বলেছেন, "যার হৃদয়ে কুরআনের কোনো অংশই মুখস্ত নেই, তার অন্তর

ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরের মতো।” (তিরমিজি) এই হাদিস কুরআনের হিফজ এবং তার বার্তা হৃদয়ে ধারণ করার গুরুত্ব তুলে ধরে।

৪. কুরআন শ্রবণ

কুরআন শ্রবণ করলে আধ্যাত্মিকভাবে অন্তরে এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নবী (সা.) একবার হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) কে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন, “আমি অন্যদের থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করি।” (বুখারি)

৫. সুন্দর তিলাওয়াত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত সুন্দরভাবে করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, “যে গায়ক নিজে গান করেছেন তিনি তার গান যতটা মনোযোগের সাথে শুনেন সে তুলনায় আল্লাহ কুরআন তিলাওয়াতকারী একজন সুন্দর কণ্ঠের মানুষকে এর চেয়ে অনেক মনোযোগ দিয়ে শোনেন।” (ইবনে মাজাহ)

তিলাওয়াতের সৌন্দর্য পাঠক এবং ঐশী বাণীর মধ্যে সংযোগ গভীরতর করে এবং এতে করে প্রশান্তি ও উত্তম ফলাফল নিশ্চিত হয়।

৬. কুরআনের মানুষ

রামাদ্বান হলো কুরআনের মানুষ হওয়ার সময়। নবী (সা.) কুরআনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, “তারা কুরআনের মানুষ, আল্লাহর মানুষ এবং তাঁরাই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন।” (ইবন মাজাহ)

“কুরআনের মানুষ” হওয়ার অর্থ হলো কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা এবং তা জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন মানব জীবনে বিপ্লব ঘটাতে এবং গোটা সম্প্রদায়কে উচ্চস্থানে উন্নীত করার সক্ষমতা রাখে। নবী (সা.) বলেছেন, “এই গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ কিছু জাতিকে উন্নত করবেন এবং অন্যদের অবনত করবেন।” (মুসলিম)

প্রথম যুগের মুসলমানরা কুরআনের শিক্ষার আলোকে জীবনযাপন করতেন, যা তাদের চরিত্র গঠন করতে, নৈতিকতা শক্তিশালী করত এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন করতেও সহায়তা করেছিল। তারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এর বার্তা লালন করতেন এবং সে আলোকে আমলও করতেন।

কুরআন : জীবনজুড়ে বয়ে যাওয়া একটি অঙ্গীকার

কুরআনের জন্য সময় দান বা কুরআনের সাথে যাত্রা শুধুমাত্র রামাদ্বান মাসেই সীমিত করে রাখা কাম্য নয়। তবে যেহেতু এ মাসে আমরা তিলাওয়াত, কুরআন নিয়ে পর্যালোচনা এবং হিফজের জন্য কিছু সময় ব্যয় করি, তাই এ মাসে কুরআনকে আমাদের হৃদয়ে এবং আমাদের ঘরে জীবন্ত করে রাখার একটি চেষ্টা অন্তত জারি রাখা প্রয়োজন। যে রামাদ্বান মাসটি সামনে আসছে তা যেন কুরআনকে জীবনব্যাপী বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। কেননা কুরআন হচ্ছে সেই হেদায়েতগ্রন্থ যা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং সত্য পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় ইবাদত কবুল করুন এবং তাঁর রহমত ও প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। আমিন।

লেখক : সাবেক সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)

রামাদ্বান, রোজা ও দু'আ

শায়খ আবদুল কাইয়ুম

আল্লাহর ইবাদতের বহুমুখী প্রয়াস চালানোর এক মহান সুযোগ নিয়ে রামাদ্বান আসছে আবারো আমাদের জীবনে। যদি এ রামাদ্বান আমরা পেয়ে যাই, তা'হলে সত্যিই তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া এক বড়ো নিয়ামত। গত রামাদ্বানের পর থেকে এ রামাদ্বান পর্যন্ত কত পরিচিত অপরিচিত জনের মৃত্যুর খবর, জানাযা দাফন কাফনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। তাদের জীবনে আর কোন রামাদ্বান আসবে না। আমাদের যদি আল্লাহ তাআলা আসছে রামাদ্বানটি পাওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমরা সবাই চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে রামাদ্বানের সর্বোচ্চ ফায়দা নেওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

সিয়াম সাধনা, ক্বিয়ামুল্লাইল, কুরআন তিলাওয়াত, দান-খয়রাত সম্ভব হলে উমরাহ পালন ইত্যাদি বহুমুখী ইবাদতের পাশাপাশি দু'আর ইবাদতটাও যেন আমরা বেশি বেশি করে করার চেষ্টা করি। যা করাটা অতি সহজ কিন্তু তা অতি বড়ো একটা ইবাদত। সাহাবি নুমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন–

إِنَّ الدُّعاءَ هو العبادةُ ثُمَّ قرأ { وَقال رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ

দু'আই (আসল) ইবাদত, অতঃপর তিনি পাঠ করলেন–

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (দু'আ কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকার বশত; আমার ইবাদত হতে বিরত থাকে, অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সুরা আল মু'মিন : ৬০)

আর এ দু'আর ইবাদতটি রামাদ্বানের অন্যতম বড়ো একটি ইবাদত। সুরা বাকারায় রামাদ্বান ও রোজা সংক্রান্ত আলোচনার মাঝখানে ১৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

অর্থ : আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আপনি বলে দিন) আমি অতি কাছে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখনই সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দান করে এবং আমার উপর ঈমান আনে। আশাকরা যায় তারা সঠিক পথের দিশা পাবে। (সুরা বাক্বারা : ১৮৬)

দু'আ না করা একটি বড়ো অপরাধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি হাদিসে বলেন–

من لم يسأل الله يغضب عليه

অর্থ : যে আল্লাহর কাছে দু'আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। (তিরমিজি)

দু'আর ফলে তাকদিরের ও পরিবর্তন হতে পারে। এ বিষয় রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন–

لا يزيدُ في العمرِ إلَّا البرُّ ولا يردُّ القدرَ إلَّا الدُّعاءُ

নেক আমল ছাড়া আর কিছুতে হায়াত বৃদ্ধি হয় না, আর দু'আ ছাড়া আর কিছুতে তাকদিরের পরিবর্তন হয় না। (তিরমিজি)

অনেক সময় আমরা কোন বিশেষ বিষয়ে দু'আ করি তার ফলাফল নগদ না পেলে আমরা মনে করি, আমাদের দু'আ সম্ভবতঃ কবুল হচ্ছে না। ফলে অনেকেই দু'আ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। হতাশ হয়ে যান। এ ভাবেই শয়তান ওয়াছ ওয়াছাহ সৃষ্টি করে মানুষকে দু'আর মতো বড়ো ইবাদত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–

يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.

গুনাহ কর্ম বা আত্বীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের জন্যে দু'আ না করলে বান্দার দু'আ কবুল হতে থাকে; যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া না করে। বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল, তাড়াহুড়া বলতে কি বুঝায়?

তিনি বললেন– বান্দাহ বলে দু'আ তো করলাম কিন্তু মনে হয় না আমার দো'আ কবুল হচ্ছে! তখন সে হতাশ হয়ে দু'আ করাই ছেড়ে দেয়। (মুসলিম)

দু'আর ফল আল্লাহর কাছ থেকে একাধিক ভাবে আসতে পারে।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন–

ما من مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ، ولا قطيعةُ رَحِمٍ ؛ إلا أعطاه بها إحدى ثلاثَ : إما أن يُعجِّلَ له دعوتَه ، وإما أن يدَّخِرَها له في الآخرةِ ، وإما أن يَصرِف عنه من السُّوءِ مثلَها . قالوا : إذًا نُكثِرُ . قال : اللهُ أكثرُ .

যখনই কোন মুসলিম এমন দু'আ করে

যাতে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার দু'আ থাকে না, আল্লাহ অবশ্যই তার বিনিময় তাকে তিনটা বিষয়ের কোন একটা দেবেনই। হয়তো তার দু'আর ফল যা চেয়েছে নগদ পেয়ে যেতে পারে। অথবা তার প্রতিদান তাকে আখিরাতে দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে জমা করে রেখে দেবেন। নতুবা, তার কাছ থেকে ঐ রকম কোন বিপদ সরিয়ে নেবেন। সাহাবাগণ বললেন– তাহলে তো আমরা অনেক দু'আ করতে

অনেক সময় আমরা কোন বিশেষ বিষয়ে দু'আ করি তার ফলাফল নগদ না পেলে আমরা মনে করি, আমাদের দু'আ সম্ভবতঃ কবুল হচ্ছে না। ফলে অনেকেই দু'আ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। হতাশ হয়ে যান। এ ভাবেই শয়তান ওয়াছ ওয়াছাহ সৃষ্টি করে মানুষকে দু'আর মতো বড়ো ইবাদত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

থাকবো। তিনি বললেন– আল্লাহর কাছে তার চেয়েও রয়েছে আরও বেশি। (তিরমিজি/আহমাদ)

তাই, একজন মু'মিনকে কবুল হওয়ার দৃঢ় আস্থা নিয়েই দু'আ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন–

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

তোমরা আল্লাহর কাছে এমন ভাবে দুআ করবে, যে দুআ কবুলের বিষয়ে তোমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আর জেনে রেখ আল্লাহ অমনযোগী অনাগ্রহী অন্তরের দু'আ কবুল করেন না। ইমাম ইবুনুল কাইয়েম (রহ.) তাঁর মাদারিজ আসসালিকীন গ্রন্থে ওমর (রা.)'র বক্তব্য বর্ণনা করেছেন–

أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه.

অর্থাৎ, আমার দু'আ কবুল হলো কিনা, এ ব্যাপারে আমি কোন দুশ্চিন্তা করি না। চিন্তা শুধু এটাই যে আমি দু'আ করতে পারলাম কিনা। যদি আমাকে দু'আ করার তাওফিক দেয়া হয়। তাহলে আমি নিশ্চত আমার দু'আ কবুলের ব্যাপারটাও তার সাথে এসেছে।

দু'আ করার আরেকটি সুন্নত আমল হচ্ছে দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)'র প্রতি দরুদ ও সালাম পেশকরা। এ প্রসঙ্গে ফুদ্বালা বিন ওবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন–

سمع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا يدعو في صلاتِه فلم يُصلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : عجِل هذا ثم دعاه فقال له ولغيرِه : إذا صلَّى أحدُكم فليبدأْ بتحميدِ اللهِ تعالى والثَّناءِ عليه ثم لْيُصلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم لِيدْعُ بعدُ بما شاءَ

অর্থাৎ: রাসুলুল্লাহ (সা.) শুনতে পেলেন একজন তার নামাজের মধ্যে দু'আ করছেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন না, এবং রাসুলল্লাহ (সা.)'র প্রতি দরুদ ও ছালাম পেশ করলেন না। তিনি বললেন, সে তাড়াহুড়া করে ফেলল। তারপর তিনি তাকে ডেকে বললেন– তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে (দোয়া করতে চায়) সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান দিয়ে শুরু করে। আল্লাহর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করে। তারপর দু'আ করবে যা করতে চায়। (হাকেম)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে:

سمِع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم رجلًا يصلِّي ، فمجَّد اللهَ ، وحمِدَه ، وصلَّى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : ادعُ ، تُجَبْ ، وسَلْ ، تُعطَ – ابوداود / الترمزي / النسائى / أحمد

রাসুলুল্লাহ (সা.) শুনতে পেলেন একজন নামাজ পড়ছেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলুল্লাহ (সা.)'র প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করলেন। তিনি তাকে বললেন, দু'আ কর তোমার দু'আ কবুল হয়ে যাবে। চাও (আল্লাহর কাছে) তোমার চাওয়া পূরণ হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, আহমাদ)

দো'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে হালার রুজি রোজগার ও হালাল খাবার ভক্ষণ। এ বিষয়ে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فى الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له / مسلم

রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলছিলেন, যে তার উভয় হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে বলছে; হে রব, হে রব.... অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম। হারাম পুষ্টি দ্বারা বেড়ে উঠেছে, কীভাবে কবুল হবে তার দু'আ। (মুসলিম)

রোজাদারের দু'আ কবুল হয়ে যায়

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন,

ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:
الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

তিন ধরনের লোকের দু'আ কবুল হয়ে যায়–

১) ন্যায় বিচারক শাসক
২) রোজাদারের দু'আ ইফতার করা পর্যন্ত
৩) মাজলুমের দু'আ

রামাদ্বান মাসের রোজার দিনগুলোতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্যান আমলের পাশাপাশি বেশি বেশি করে দু'আ করার তাওফিক দান করুন। দু'আসহ আমাদেরকে যাবতীয় আমলগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

লেখক : ইসলামিক স্কলার; ইমাম ও খতিব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ।

রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল-এর ফজিলত

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ। রামাদ্বানে ক্বিয়ামুল্লাইল ও উমরার ফজিলত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে দীর্ঘ দিন থেকে তামান্না থ াকলেও সম্ভব হয়ে উঠছিল না, অবশেষে আল্লাহর রহমতে তা সম্ভব হয়েছে জনাব এ.ডি.এম. ইউনুছ ভাইয়ের অধিক পীড়াপীড়িতে। আল্লাহ ভাইকে আজরে আজিম প্রদান করুন। ক্বিয়ামুল্লাইল সম্পর্কে রাসুল (সা.) কে উৎসাহিত করতে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

"হে বস্ত্র আবৃতকারী! রাত্রিতে তাহাজ্জুদে দাঁড়ান, তবে রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা কিছু বেশি এবং এতে কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে (তাড়াহুড়ো করে নয়)। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি অতিভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয় ইবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।" (সুরা মুজ্জাম্মিল : ১-৫)

অন্যত্র বলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশার আলোকে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম (নিয়ামতে পরিপূর্ণ) প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" (আলিফ-লাম সাজদাহ : ১৬-১৭)

আল্লাহ সুরা ক্বাফের অন্য আয়াতে আরও বলেছেন, "রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাজের পশ্চাতেও।" (সুরা ক্বাফ : ৪০)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

"এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।" (সুরা দাহর : ২৫-২৬)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

"এবং যারা রাত্রিযাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে।" (সুরা ফুরক্বান : ৬৪)

ক্বিয়ামুল্লায়ল সম্পর্কে রাসুল (সা.) এর আমল

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; তবে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিতেন না। এরপর তিনি বলতেন– যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রামাদ্বান মাসে কিয়াম করবে (রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন এবং এ বিষয়টি এভাবেই রয়ে গেল (অর্থাৎ তারাবি নামাজ জামাতে পড়া হত না)। আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালেও এভাবেই থাকল এবং উমর (রা.) এর খিলাফতের শুরুর দিকেও এভাবেই থাকল।

আমর বিন মুররা আল-জুহানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুযাআ গোত্রের এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার কী অভিমত, আমি যদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল (বার্তাবাহক), পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, একমাস রোজা রাখি, রামাদ্বান মাসে কিয়াম পালন করি এবং যাকাত প্রদান করি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে সে তো সিদ্দিকীন ও শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারদের সর্বোচ্চ দু'টি স্তর লাভে সক্ষম হবে)।"

লাইলাতুল ক্বদরকে নির্দিষ্টকরণ

রামাদ্বান মাসের সর্বোত্তম রাত্রি হলো– লাইলাতুল ক্বদর। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী– "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদরে কিয়াম পালন করবে (ফলে তাকে তাওফিক দেওয়া হবে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

এ রাতটি হচ্ছে– অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ২৭শে রামাদ্বানের রাত। অধিকাংশ হাদিস থেকে এ অভিমতটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– যিরর বিন হুবাইশ (রা.) এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কাব (রা.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তাকে বলা হল– আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর কিয়ামুল লাইল পড়বে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবেই! তখন উবাই (রা.) বললেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে মানুষ এক অভিমতের উপর নির্ভর করে বসে না থাকে। ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় লাইলাতুল ক্বদর রামাদ্বান মাসে। আল্লাহর শপথ, আমি জানি এটি কোন রাত্রি। এটি সেই রাত্রি যে রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ক্বিয়াম পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সে রাতটি ছিল (রামাদ্বানের) ২৭তম রজনি ছিল।

ক্বিয়ামুল লাইল এর নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার শরয়ি অনুমোদন

রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইলের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা শরিয়ত সম্মত; বরং সেটা একাকী আদায় করার চেয়ে উত্তম। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামুল লাইল এর নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার কারণে এবং তিনি জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল এর নামাজ আদায় করার ফজিলত বর্ণনা করার কারণে। যেমনটি আবু যার (রা.) এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, "আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রামাদ্বানের রোজা রাখলাম। তিনি গোটা মাস আমাদের নিয়ে কিয়ামুল লাইল পড়েননি। তবে, মাসের সাতদিন বাকি থাকতে (২৩তম রজনিতে) তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ কিয়ামুল লাইল আদায় করলেন। যে রাত্রিতে মাসের আর ছয়দিন বাকি ছিল সে রাতে (২৪তম রজনিতে) কিয়াম করেননি। মাসের আর পাঁচদিন বাকি থাকতে (২৫তম রজনিতে) আবার অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যদি আজকের গোটা রাতটা আমাদেরকে নিয়ে নফল নামাজ পড়তেন। তখন তিনি বললেন, যদি কেউ ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামাজ পড়ে; তাহলে তার জন্য গোটা রাত কিয়াম পালন করার সওয়াব হিসাব করা হবে। এরপর যখন মাসের আর চারদিন বাকি ছিল সে রাতে তিনি কিয়াম করেননি। যখন আর তিনদিন বাকি ছিল সে রাতে (২৭তম রজনিতে) তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকলকে জাগিয়ে দেন। সে রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তেই থাকলেন, পড়তেই থাকলেন। এক পর্যায়ে আমাদের আশঙ্কা হল যে, আমাদের 'ফালাহ' ছুটে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কী? তিনি বললেন, সেহেরি। এরপর তিনি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আর কিয়ামুল লাইল পালন করেননি।" (হাদিসটি সহিহ, সুনান গ্রন্থাকারগণ হাদিসটি সংকলন করেছেন)

নবী (সা.) জামাতের সাথে 'ক্বিয়ামুল লাইল' পালন করা অব্যাহত না রাখার কারণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের অবশিষ্টাংশ জামাতের সাথে কিয়ামুল পালন না করার কারণ হচ্ছে, এই আশঙ্কা যে, না-জানি রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করা তাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়। তখন তারা সেটা পালন করতে সক্ষম হবে না। যেমনটি এসেছে আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যা সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ইসলামী শরিয়তকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশঙ্কাটি দূর হয়ে গেছে। অতএব, আশঙ্কার কারণে গৃহীত পদক্ষেপ তথা কিয়ামুল লাইলে জামাত বর্জন করাও দূরীভূত হয়ে গেল এবং পূর্বের হুকুম বহাল থাকল; সেটা হচ্ছে জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার অনুমোদন। এ কারণে উমর (রা.) এ বিধানটিকে পুনর্জীবিত করেছেন; যেমনটি সহিহ বুখারি ও অন্যান্যদের বর্ণনাতে এসেছে।

মহিলাদের জামাতের সাথে ক্বিয়ামুল লাইল পালনের অনুমোদন

যেমনটি পূর্বোক্ত আবু যার (রা.) এর হাদিসে এসেছে যে, মহিলাদের জন্য জামাতে হাজির হওয়া শরিয়তসম্মত। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষদের ইমামের পরিবর্তে আলাদা ইমাম নির্ধারণ করাও জায়েজ। কেননা, উমর (রা.) যখন জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করলেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই বিন কা'ব (রা.) কে এবং মহিলাদের জন্য সুলাইমান বিন আবু হাছমা (রা.) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন।

ক্বিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা

কিয়ামুল লাইল এর নামাজ ১১ রাকাত। এক্ষেত্রে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে, রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এর চেয়ে বেশি রাকাত না বাড়ানো। কেননা তিনি মৃত্যু অবধি কিয়ামুল লাইল নামাজের রাকাত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বাড়াননি। আয়েশা (রা.) কে রামাদ্বান মাসে তাঁর কিয়ামুল লাইল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদ্বানে কিংবা রামাদ্বান ছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি নামাজ পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামাজ পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না! এরপর আরও চার রাকাত নামাজ পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিন রাকাত নামাজ পড়তেন। (মুত্তাফাক্ব আলাইহি)। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর চেয়ে কম সংখ্যক বিতিরের নামাজ পড়তে পারেন। এমনকি এক রাকাত বিতিরও পড়তে পারেন। তবে ২০ রাকাতের উপর যেহেতু সাহাবিদের সম্মিলিত মত রয়েছে, এজন্য যারা পড়তে চান, তারা ২০ রাকাত পড়লেও পড়তে পারেন।

এবার তাঁর কর্মের দলিল, আয়েশা (রা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয় রাকাত বিতির নামাজ পড়তেন? তিনি বলেন, "চার রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ছয় রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। দশ রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। তিনি সাত রাকাতের চেয়ে কম কিংবা তের রাকাতের বেশি বিতির নামাজ আদায় করেননি" (সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদন ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ)। আর তাঁর কথার দলিল হচ্ছে– "বিতির সত্য। কেউ চাইলে পাঁচ রাকাত বিতির পড়তে পারে। কেউ তিন রাকাত পড়তেও পারে। কেউ এক রাকাত বিতির পড়তে পারে।"

ক্বিয়ামুল লাইল এর নামাজে কুরআন তেলাওয়াত

রামাদ্বানে কিংবা অন্য সময়ে কিয়ামুল লাইলে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করেননি যে, সে সীমার চেয়ে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। বরং নামাজের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ক্বেরাতও দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত হতো। তিনি কখনও এক রাকাত নামাজে يا أيها المزمل (ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল) পড়তেন। এ সুরাটির আয়াত সংখ্যা ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়তেন।

সহিহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমর (রা.) যখন রামাদ্বান মাসে উবাই বিন কাব (রা.) কে লোকদের ইমাম হয়ে ১১ রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন, তখন উবাই (রা.) একশত আয়াত সম্বলিত সুরাগুলো দিয়ে তেলাওয়াত করতেন। তাঁর পেছনে যারা নামাজ পড়ত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তাদেরকে লাঠির ওপর ভর করতে হতো। তারা ফজরের কাছাকাছি সময়ে নামাজ শেষ করতেন।

ক্বিয়ামুল লাইল এর সময়কাল

কিয়ামুল লাইল এর সময় এশার নামাজের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি

নামাজ দিয়েছেন, সে নামাজটি হচ্ছে বিতিরের নামাজ। তোমরা এশার নামাজ ও ফজরের নামাজ মাঝখানে সে নামাজটি আদায় কর।" যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে নামাজ আদায় করা উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না তবে সে যেন প্রথম রাত্রিতে বিতিরের নামাজ আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন শেষ রাতে বিতিরের নামাজ আদায় করে। কারণ শেষ রাতের নামাজে (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। তাই সেটি উত্তম।" যদি ব্যাপারটি এ রকম হয় যে, প্রথম রাতে নামাজ পড়লে জামাতের সাথে পড়া যাবে। আর শেষ রাতে পড়লে একাকী পড়তে হবে; সেক্ষেত্রে জামাতের সাথে পড়াই উত্তম। কেননা জামাতের সাথে পড়লে সেটাকে সমস্ত রাত নামাজ পড়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমর (রা.) এর মন্তব্য : 'এটি কতই না উত্তম বিদাত'!

উমর (রা.) এর জামানায় এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আমল। আব্দুর রহমান বিন উবাইদ আল-ক্বারি বলেন, একবার রামাদ্বানের একরাত্রিতে আমি উমর (রা.) এর সঙ্গে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। এসে দেখলাম লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামাজ আদায় করছে। কেউ একাকী নামাজ পড়ছে। কারো পেছনে একদল লোক নামাজ পড়ছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি আমি যদি এদের সবাইকে একজন ক্বারির পেছনে একত্রিত করি সেটা উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সবাইকে উবাই বিন কা'ব (রা.) এর পেছনে একত্রিত করলেন। তিনি বলেন, এরপর অন্য এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হলাম; গিয়ে দেখলাম লোকেরা তাদের ক্বারির পেছনে নামাজ পড়ছে। তখন উমর (রা.) বলেন, এটি কতই না ভালো বিদাত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা যে সময়টা নামাজ পড়ে সে সময়ের চেয়ে উত্তম (তিনি শেষ রাতের কথা বুঝাতে চেয়েছেন)। লোকেরা প্রথম রাত্রিতে নামাজ পড়তেন।"। যায়েদ বিন ওয়াহব বলেন, "রামাদ্বান মাসে আব্দুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তেন এবং অনেক রাতে নামাজ শেষ করতেন।"

বিতিরের তিন রাকাত নামাজ পড়ার পদ্ধতি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যখন তিন রাকাত বিতিরের নামাজ পড়তে নিষেধ করেন এবং এ নিষেধাজ্ঞার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন, "যেন তোমরা মাগরিবের নামাজের সাথে সাদৃশ্য না কর।" সে জন্য মাগরিবের নামাজের সাথে সাদৃশ্য থেকে বের হওয়ার দুইটি পদ্ধতি হতে পারে–

(ক) জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে ফেলা (অর্থাৎ দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলা)। এই অভিমতটি অধিক শক্তিশালী ও উত্তম। আল্লাহু আ'লাম।

(খ) জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে না বসা। (এটি উত্তম না হলেও কেউ পড়লে সালাত আদায় হয়ে যাবে)।

বিতিরের তিন রাকাত নামাজে ক্বেরাত পড়ার পদ্ধতি

তিন রাকাত বিশিষ্ট বিতিরের নামাজের প্রথম রাকাতে سبح اسم ربك الأعلى (সুরা আ'লা) পড়া, দ্বিতীয় রাকাতে قل يا أيها الكافرون (সুরা কাফিরুন) পড়া এবং তৃতীয় রাকাতে قل هو الله أحد (সুরা ইখলাস) পড়া সুন্নত। কখনও কখনও এর সাথে قل أعوذ برب الفلق (সুরা ফালাক্ব) ও قل أعوذ برب الناس (সুরা নাস) মিলাবে।

দোয়া কুনুত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহিত্র হাসান বিন আলী (রা.) কে যে দোয়াটি শিখিয়েছেন সে দোয়াটি দিয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়া উত্তম। সে দোয়াটি হচ্ছে–

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت

تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك

মাঝে মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়বে। উল্লেখিত দোয়ার সাথে হাদিসে বর্ণিত ও বিখ্যাত কিতাবে লিখিত অন্য যে কোন দোয়া, সঠিক ও ভালো অর্থবোধক দোয়া যুক্ত করতে কোন বাধা নেই।

কুনুতে নাজিলাহ

যে ব্যক্তি রুকুর পরে দাঁড়িয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়েন তাতে কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখিত দোয়ায়ে কুনুতের উপর বাড়তি দোয়া যেমন, রামাদ্বানের দ্বিতীয় অর্ধাংশে কাফেরদের ওপর লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা উমর (রা.) এর সময়কালের ইমামদের আমল থেকে এগুলো সাব্যস্ত আছে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়বে।

সাধ্যানুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করবে। রাসুল (সা.) ইসলামের দুশমনদের শত্রুতার সময়ে লা'নত দিয়েও কুনুতে নাজিলাহ পড়েছেন। তিনি বলেন– তিনি যখন কাফেরদেরকে

লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া, মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ করতেন তখন বলতেন,

اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق

এরপর তাকবির দিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। বিতির নামাজের শেষাংশে কী বলবে– বিতিরের নামাজের শেষ দিকে (সালাম ফিরানোর আগে কিংবা পরে) যা বলা সুন্নত।

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك

রামাদ্বানে উমরাহ পালনের সওয়াব ও উমরার সহজ পদ্ধতি

উমরাহ ইসলামের অন্যতম একটি পবিত্র সুন্নাহ এবাদত। আল-কুরআনে উমরাহ পালনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের পরোক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। এ উমরাহই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির সুযোগ তৈরি করে। এটি শুধু একটি আধ্যাত্মিক আমল বা ইবাদতই শুধু নয়, বরং আল্লাহর বাড়িতে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে বান্দাহ কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুয়া করে তার জীবনের প্রতিটি গুনাহ থেকে মাগফেরাত বা ক্ষমা চাওয়ার একটি মোক্ষম সুযোগ। এই ইবাদত পালনে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, "আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর" (সুরা বাক্বারাহ : ১৯৬)। আর রাসুল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি রামাদ্বানে উমরাহ করল সে যেন আমার সাথে হাজ্জ করল।" অপর হাদিসে তিনি বলেছেন, "এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ পর্যন্ত মাঝখানে যত পাপ হয়েছে, উভয় উমরার মধ্যখানের সকল পাপ আল্লাহ মুছে ফেলবেন।" তাই পাপ মুছনের উদ্দেশ্যে সময় করে হলেও আমাদের উমরাহ পালনে যাওয়া ভাল। উমরাহ পালনে আগ্রহীদের জন্য ক্রমান্বয়ে (স্টেপ বাই স্টেপ) উমরাহর করণীয় ও বর্জনীয়গুলো এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

উমরার ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাহ আমলসমূহ :

উমরাহ পালন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। এখানে একনজরে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করা হলো। সুন্নাহ আমলে যদিও কিছু মাসআলায় ভিন্নমত রয়েছে, কিন্তু ফরজ ও ওয়াজিবে তা নেই।

উমরার ফরজ আমল ২টি। যথা–

১. নিয়তসহ ইহরাম বাঁধা এবং
২. মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা।

উমরার ওয়াজিব আমল ৩টি। যথা–

১. মিকাতের সীমানায় প্রবেশের পূর্বেই নিয়ত করা;
২. সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখান প্রদক্ষিণ করা এবং
৩. মাথার চুল মুণ্ডানো অথবা ছোট করে ছাঁটানো।

উমরার মধ্যে সুন্নাহ আমল অনেক, তাই ধারাবাহিক না বলে সুন্নাহ আমলসমূহ প্রতিটি মানাছিক বা কার্যক্রমের অধীনে বর্ণনা করে ফেললে বুঝতে ও আমল করতে সুবিধা হবে।

নিম্নে একে একে ফরজ আমলের ব্যাখ্যা পেশ করা হলো

০১. ইহরাম : (ফরজ)

উমরাহ পালন করার জন্য ইহরাম করা ফরজ। ইহরামের পোশাক পরার আগে কিছু সুন্নত আমল রয়েছে। যথা–

- নখ-চুল পরিষ্কার করে গোসল করে নেওয়া উত্তম, (যদিও উমরার ইহরাম পরতে অজু শর্ত নয়);
- মিকাতে পৌঁছার আগে বা মিকাতে পৌঁছেই ইহরামের কাপড় পরে নেওয়া;
- উমরাহর নিয়ত আরবিতে করা اللهم لبيك عمرة (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান) এবং
- নিয়ত করার পর এক বা তিনবার নিম্নোক্ত তালবিয়া পড়া, এমনকি পথিমধ্যে এ দোয়া পড়তে পড়তে মক্কায় প্রবেশ করা, কা'বা ঘর দেখার সাথে সাথে দোয়া পড়া বন্ধ করা। যা পুরুষ-মহিলা অনেক হাজিই জিকরের অংশ হিসেবে বেখেয়ালে করেন না। অথচ উমরার কাজ সেরে ফেললে আল্লাহর বাড়িতে যতদিন অবস্থান করা হবে এ সময়ে সবচেয়ে বড়ো কাজই হলো আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকা, তাই ইহরামের পর থেকেই উমরাহকারী/হাজিগণ অধিক হারে তালবিয়া পাঠ করবেন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَبَّيْكَ

তালবিয়ার আরবি উচ্চারণ

"লাব্বাইকা আলাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা।" অর্থ : "আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার কোন অংশীদার নেই, আমি হাজির, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত তোমার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য তোমার, তোমার কোন অংশীদার নেই।"

০২. তাওয়াফ : (ফরজ)

তাওয়াফ করার প্রস্তুতি হিসেবে অজু সহকারে যে সুন্নাহ আমলগুলো করতে হয় :

- কা'বার সামনা সামনি হয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" পড়ে তাওয়াফের নিয়ত করা;
- ইহরামের চাদর ডান কাঁধে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে ৭বার কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করা;
- হাজরে আসওয়াদকে বাম পাশ বরাবর রেখে ধীরে ধীরে কাউকে কষ্ট না দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটা;
- মহিলা-পুরুষ তাওয়াফকারী কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে ইবাদত মনে করে হেঁটে চলা;
- সম্ভব হলে প্রথম ৩ চক্করে একটু দৌড়ের ভাব করে জগিং করে চলা (মহিলারা তা করবেন না);
- আরবিতে দোয়া-দুরূদ যা জানেন তা ধীরস্থির ভাবে চুপিসারে পড়া, যাতে অন্যদের কষ্ট না হয় এবং
- তবে রুকনে ইয়ামানি হতে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছতে রাব্বানা আতিনা... যথাসম্ভব বেশিকরে পড়া।

ভিড় না থাকলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা। ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে সরাসরি চুম্বন করা কঠিন হলে চুম্বনের চেষ্টা না করা। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা চুম্বন করা সম্ভব না হলে দূরত্বে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা এবং এক হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করা। এই ক্ষেত্রে চুম্বন বা হাত স্পর্শ করা আবশ্যক নয়। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করা। কোন কারণে উপরের কোন সুন্নাহ আমল আদায় না করতে পারলে উমরাহ পালনে কোন ক্ষতি হবে না, সওয়াব একটু কম হবে, কিন্তু উমরাহ আদায় হয়ে যাবে।

এবার একে একে ওয়াজিব আমলের ব্যাখ্যা পেশ করা হলো

০১. মিকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা

এমন অনেক হাজি আছেন, যারা না জেনে উমরাহ করতে চলে গেছেন এবং মনগড়া উমরাহর করা শুরু করে দেন। এত কষ্ট করে সেখানে গিয়ে মনগড়া আমল না করে নবী (সা.) যে তরিকায় উমরাহ আদায় করেছেন এভাবে আদায়ে সচেষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সকল আমলেই নবী (সা.) -এর অনুসরণই সবচেয়ে বড়ো কথা। তাই মিকাতে পৌঁছার পূর্বেই ইহরাম বেঁধে ফেলা শর্ত, কেউ যদি ইহরাম না পরে মিকাত অতিক্রম করে ফেলে তাহলে তার উমরাহ হবে না। মনে রাখতে হবে, ইহরাম পরা ফরজ, কিন্তু মিকাতের পূর্বে পরা ওয়াজিব, এজন্য কেউ ভুলে মিকাত অতিক্রম করে ফেললে তাকে অবশ্যই 'দম'

দিতে হবে, নতুবা তার উমরাহ বাতিল।

০২. সাঈ করা (ওয়াজিব)

সাঈ করার পদ্ধতি হলো–

- সাফা পাহাড়ের কাছে গিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কুরআন বর্ণিত দোয়া পাঠ করে শুরু করা;
- দোয়ার মতো হাত তুলে তিনবার لا إله إلا الله وحده لا شريك له এ পূর্ণ দোয়াটি পাঠ করা;
- لا إله إلا الله وحده -এর ৩টি দোয়া রয়েছে, কিতাব দেখে এগুলো শেখা নেওয়া উত্তম;
- সাফা থেকে মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে এবং পুনরায় মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত হেঁটে চলা;
- মারওয়া পাহাড়ের কাছে পৌঁছালে, কা'বার দিকে মুখ করে হাত তুলে অনুরূপ দোয়াগুলো পড়া এবং
- এভাবে দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার ধীরে হেঁটে চলা, তবে মাঝ বরারর সবুজ লাইটে দৌঁড়ে চলা।

০৩. চুল মুণ্ডন করা (ওয়াজিব)

চুল মুণ্ডন করা (ওয়াজিব)। পুরুষের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করা। তবে কেউ চাইলে মাথার চুল ছাঁটতেও পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের (মাহরাম) নিজ সঙ্গী পুরুষ কেউ তাদের মাথার উপর থেকে ধরে নিচে থেকে মাত্র এক বা আধা চুল কেটে ফেলা। উমরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি পালনের সময় কিছু কাজকে গুরুত্ব দিতে হয় এবং কিছু কাজ বর্জন করতে হয়। এখানে উমরাহ পালনের করণীয় ও বর্জনীয়গুলো কাজগুলো একে একে তুলে ধরা হলো-

উমরাহ পালনে ও উমরাহ পালনের পর কিছু করণীয়

- সুযোগ পেলে পুরুষরা বিল্ডিং এর উপরে ঘুরে ঘুরে নফল তাওয়াফ করতে পারেন;
- তবে মহিলাদের জন্য এ নিয়ম নেই, তারা চাইলে মাতাফে গিয়ে নফল তাওয়াফ করতে পারবেন;
- কিন্তু মহিলা-পুরুষ হাজিদের ঠেলে বা ধাক্কা-ধাক্কি করে তাওয়াফ করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই;
- তাওয়াফে মহিলারা নিক্বাব ব্যবহার না করে নিজ ওড়নার আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে নেবে;
- হাজিগণ ইহরামের হালতে নিজের বা পরের জন্য বিয়ে-শাদীর কোন প্রস্তাব করতে পারবে না;
- যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ জমজমের পানি পান করা সুন্নত, তবে দাঁড়িয়ে নয় বসিয়ে পান করবেন;
- মাকামে ইবরাহিমের ঠিক পেছনে দূরত্বে গিয়ে হলেও তাওয়াফের পর দু'রাকাত সালাত আদায় করা;
- ভিড় এড়াতে পারলে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া, তবে এজন্য ঠেলাঠেলি বা জোর করা যাবে না;
- কা'বা ঘরের মুলতাযাম বা চৌকাঠ ধরে দোয়া করা যেতে পারে (তবে এটি উমরার অংশ নয়);
- সর্বদা ইবাদতের মানসিকতা পোষণ করে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ধীরে ধীরে চলবেন, এটাই উত্তম;
- যতদিন সেখানে থাকা হবে অলসতা করে হোটেলে সালাত না পড়ে বরং হারামে গিয়ে সালাত পড়া;
- যথাসম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা এবং সময় করে অর্থসহ কুরআন বুঝে পড়া;
- অধিকহারে তাসবিহ ও জিকরের দোয়াগুলো পড়তে মশগুল থাকা, তবে বই দেখে দেখে নয়;
- আল্লাহ ঘরের সামনে কান্না-কাটি করে মাগফিরাতের জন্যে তাওবাহ করা, তবে আওয়াজ করে নয় এবং
- নিজের জন্য, মৃতদের জন্য ও যাওয়ার সময়ে যারা দোয়া চেয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে খাস দোয়া করা

উপরিউক্ত কাজগুলো কেউ করতে না পারলে উমরার কোন ক্ষতি হবে না, তবে করতে পারলে নিজের সওয়াব বৃদ্ধি হবে, আল্লাহ তা'য়ালার বাড়িতে থাকা অবস্থায় সব ধরনের অনৈতিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন ও আমাদের উমরাহ কবুল করুন।

উমরাহ পালনে যা যা বর্জনীয়

- ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে লিপ্ত হওয়া, এমনকি পরস্পরে আলিঙ্গন করা, চুমু দেওয়া;
- দাঁড়ি বা গোঁফ কাটা ও মুণ্ডন করা, চুল বা নখ কাটা, ছেঁড়া নখ টেনে তুলে ফেলা;
- বেখেয়ালে শরীরের কোন জায়গা থেকে টেনে টেনে লোম তোলা;
- সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করা, এমনকি সেন্টযুক্ত সাবান বা লিকুইড দিয়ে হাত ধোয়া;
- স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি বা কারো সাথে ঝগড়া বা গালাগালি করা;
- মশা, মাছি বা কোন প্রাণী মেরে ফেলা বা পশু শিকার করা কিংবা শিকারে সাহায্য করা;
- কোন গাছ-গাছালির লতা-পাতা কিংবা গাছ ছেঁড়া এবং ধুমপান করা অবশ্যই বর্জনীয় এবং
- পারস্পরিক মন্দ কথা বলাবলি করা ও অতিরিক্ত শপিং এ

ব্যস্ত হয়ে না যাওয়া।

ভুলত্রুটির জন্য কাফফারাহ

কোন ফরজ আমল বাদ পড়ে গেলে উমরাহ আদায় হবে না। তবে কোন ওয়াজিব আদায়ে ভুল হয়ে গেলে 'দম' দিয়ে শুধরানো যায়। আর কোন সুন্নত কাজ বাদ পড়ে গেলে উমরাহ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ছোট-খাট ভুল হয়ে গেলে স্থানীয় ফকির-মিসকিনকে সামান্য কিছু ছাদাক্বাহ দিয়ে দিলেই চলবে। পরিশেষে অনুরোধ, সকল হাজিকে হাজ্জ বা উমরায় যাওয়ার পূর্বে ভালোভাবে দু'একটি বই পড়ালেখা করে যাওয়াই উত্তম।

মক্কাতুল মুকাররামায় সাধারণ জিয়ারাহ

আপনার উমরাহ পালন শেষে সময় থাকলে আপনি একা অথবা আপনার পরিবারসহ এবার কুরআন অবতরণের দেশে নিচের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করলে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করবেন, যেমন :

১. রাসুল (সা.) এর জন্মস্থান, যেখানে এখন সরকার লাইব্রেরি বা খুতুবখানাতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে;

২. আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের বাড়ি (কার কোথায় ঘর-বাড়ি ছিল);

৩. হারামের লাইব্রেরি (অবসর সময়ে অধ্যনের জন্য বিশাল লাইব্রেরি, আরবি কিতাব বসে পাঠ করা যায় মাত্র);

৪. প্রথম কুরআন (ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক্ব) অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : হেরা গুহা;

৫. জাবালে ছৌর : যে পর্বতে রাসুল (সা.) হিজরতের সময়ে আবু বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন;

৬. মানসিকে হাজ্জের পবিত্র স্থান সমূহ : মিনা, মুজদালিফাহ, আরাফাহ, জাবালে রাহমাহ ইত্যাদি

এ স্থানগুলো একদিনেই ঘুরে-ফিরে পরিদর্শন করা যায়, তাই উবার করে নিজ দায়িত্বে অথবা কোন গাইড সাথে নিয়েও এগুলো দেখা করা যায়। এ ছাড়াও আরও কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা দেখার কোন প্রয়োজন নেই যেমন : সাত মসজিদ (যেসব মসজিদে নিয়ে গাইডরা নফল নামাজ পড়তে বলে), কবুতর বাগান, শপিং সেন্টার ইত্যাদি। স্থানীয় গাইডরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে হাজিদের ঐসব স্থানে নিয়ে যেতে চায়।

জিয়ারাতে মদিনা তাইয়েবাহ

মদিনা তায়য়েবায় পৌঁছার পূর্বেই নবী (সা.) এর প্রেমে নিয়মিত দুরূদ পড়তে থাকা, যে দুরূদদ্বয় আমরা নামাজের মধ্যে প্রতিদিন পড়ে থাকি, সেটাই উত্তম দুরূদ। সেখানে নবী (সা.) এর কবর পরিদর্শন করা ছাড়া আর তেমন কোন আমল নেই বা দর্শনীয় এমন কোন স্থান নেই যা না দেখলে বা পরিদর্শনে না গেলে অথবা উমরাহ কবুল হবে না। আমাদের সমাজে এত গুরুত্ব দিয়ে মদিনা জিয়ারত করার প্রচলন রয়েছে, তাই অনেকে মদিনা জিয়ারতকে উমরাহ পালনের অংশ হিসেবে মনে করে, এমনকি মদিনা না গেলে তার উমরাহ যেন অসম্পূর্ণ রয়েছে বুঝা যায়। তবে যেহেতু মক্কায় উমরার উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়েছে, আর হয়ত জীবনে যাওয়া নসিব নাও হতে পারে তাই আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর কবর জিয়ারত না করে কেমনে আসি, তাই এ সুযোগকে হাত ছাড়া করা ঈমানের অংশ বলা যায়। ফলে সকল উম্মতের উচিত, যারাই মক্কায় উমরার উদ্দেশ্যে যাবেন, তারা সময় করে নবী (সা.) এর কবর জিয়ারত করে আসবেন। এ জিয়ারতে গিয়ে যে সকল স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন তা হলো :

১. রাসুল (সা.) -এর রওদা/রওজা জিয়ারত;

২. উহুদ পাহাড় ও উহুদের পাদদেশে কাফেরদের সাথে উহুদ যুদ্ধের স্থান;

৩. উহুদে শহিদ হওয়া সাহাবিদের কবর জিয়ারত;

৪. উসমান (রা.)-এর খেজুর বাগান, যা তিনি খেলাফতের সময় সরকারি তহবিলে সমাজ কল্যাণে দান করেছিলেন;

৫. মসজিদে কুবা জিয়ারত ও এতে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় (যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি অথবা হোটেলে অজু করে মসজিদে কুবায় গিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে সে একটি মকবুল উমরার সওয়াব পাবে) এবং

৬. মসজিদে ক্বিবলাতাইন জিয়ারত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন। আল্লাহ তা'য়ালা সকল জিয়ারত কারীর সফর ও উমরাহ কবুল করুন।

অ-আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরে বর্ণিত উমরার নিয়মাবলী কেবল রামাদ্বান মাসের জন্য উমরার জন্য নির্দিষ্ট নয়, যেকোন সময়ে উমরাহ পালনের জন্যই এ নিয়ম।

লেখক : উলামা এন্ড রিলিজিয়াস লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি, এমসিএ।

রোজা : তাক্বওয়া ও প্রকৃত জ্ঞান

ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা

কেন ও কীভাবে?

প্রথমে আমরা দেখে নেই তাকওয়া কী জিনিস। এরপর দেখবো আল্লাহপাক রোজার মাধ্যমে কী জ্ঞান দিতে চান? কেন দিতে চান?

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দেওয়া কুরআনের– হিদায়েতের বিধান অনুযায়ী চলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। যখন আমার রোজা রাখি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তখন আমরা আসলে আমাদের নাফসের অন্যায় চাহিদা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাই; এই প্রচেষ্টায় নফসের উপর সফল হলে আমাদের তাকওয়া অর্জিত হবে যা হবে আমাদের হাতিয়ার বা উপায় দুনিয়া আখিরাতের ব্যর্থতা থেকে বাঁচার। এখন প্রশ্ন হলো রোজার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আরও কী দিতে চান আমাদেরকে? সবচেয়ে বড়ো যেই জিনিসটি দিতে চান তা হলো জ্ঞান।

কেন জ্ঞান দিতে চান?

কারণ সত্যিকার জ্ঞান অর্জিত না হলে আল্লাহর সত্যিকার খলিফা হওয়া যায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিপূর্ণ ভাবে চলা যায় না। আমি যেই জ্ঞানের কথা বলছি তা শুধু তথ্যের আহরণ নয়; তা উপলব্ধির জ্ঞান যা তথ্যের উপর খুব বেশি নির্ভর করে না। এই বিশেষ জ্ঞান আল্লাহ্পাক রোজাদারকে কীভাবে দেন? দুইভাবে–

১. বান্দার মন ও দেহকে বিশেষভাব প্রস্তুত করেন যেন দেহ-মন ডাইরেক্টলি শুধু তথ্যের উপর নির্ভর না করে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। রামাদ্বানের মাধ্যমে আমাদের হার্ট ও ব্রেন কে পরিষ্কার করা হয়। আমাদের স্পিরিচুয়াল হার্ট কে নফসের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়; আমাদের স্পিরিচুয়াল হার্ট তখন অন্য মাত্রার জগতের সাথে সহজেই কানেক্টেড হতে পারে ও জ্ঞান আহরণ করতে পারে। চারপাশে আল্লাহর নিদর্শন সহজে দেখে বুঝতে পারে।

আমাদের প্যারাসিমপ্যাথেটিক নারভাস সিস্টেমকে এক্টিভেট করা হয় রোজার মাধ্যমে এবং রাতে বেশি নামাজের মাধ্যমে যাতে রুহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং রূহ অন্য মাত্রার জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই রোজার মাধ্যমে কল্যাণকর জ্ঞান আহরণ করতে হলে, রোজাতে কম খেতে হবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে বেশি করে।

২. কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক আমাদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে চান এই রামাদানে। আল্লাহপাক অন্য মাসেও কুরআন নাজিল করতে পারতেন কিন্তু রোজার এই মাসে কেন? অনেক কারণ রয়েছে এর মধ্যে হলো একটি হলো– রোজার মাধ্যমে আমাদের শরীর মন যখন পবিত্র হয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হয় তখন কুরআন পড়লে কুরআন থেকে বেশি মনি মুক্ত সংগ্রহ করা যায় এবং কুরআনের বিধানগুলো

আল্লাহপাক অন্য মাসেও কুরআন নাজিল করতে পারতেন কিন্তু রোজার এই মাসে কেন? অনেক কারণ রয়েছে এর মধ্যে হলো একটি হলো– রোজার মাধ্যমে আমাদের শরীর মন যখন পবিত্র হয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হয় তখন কুরআন পড়লে কুরআন থেকে বেশি মনি মুক্ত সংগ্রহ করা যায় এবং কুরআনের বিধানগুলো মানা সহজ হয়।

মানা সহজ হয়। যখন রাতে তারাবীহতে ও তাহাজ্জুদে বান্দাহ বিনয়ের সহিত দীর্ঘক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে এবং দিনে ও অধ্যয়ন করে তখন রোজাদার বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে থাকে যা তাকে তাকওয়ার উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়। রোজা যেমন নাফ্সকে পরাজিত করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করায় আমাদেরকে, তেমনি কুরআন ও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করায় কুরআনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করানোর মধ্য দিয়ে; একটি আরেকটির পরিপূরক। সুবহানাল্লাহ। রামাদানে এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জনের ব্যবস্থা করেছেন।

আসুন তাই কম খেয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখে এবং রাতে ও দিনে গভীর মনোযোগের সহিত পবিত্রদেহ মনে কুরআন অধ্যয়ন করে পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মুত্তাকী হয়ে আল্লাহর জমিনে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী হই ।

লেখক : বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক।

আল-কুরআন, রামাদ্বান এবং
মানবজীবনে রোজার শিক্ষা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মাদ ইউনুস

রামাদ্বানের নামকরণ এবং অর্থ

রামাদ্বান শব্দটি আরবি শব্দ “রময” (رمض) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো দহন বা জ্বালিয়ে দেওয়া। এই শব্দটি প্রাচীন আরবদের প্রথা অনুযায়ী এমন এক সময়ের নাম, যখন মাটিতে তীব্র গরম অনুভূত হতো। তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে “রময” বিশেষ অর্থ বহন করে, যা পাপের দহন এবং আত্মার শুদ্ধিকরণ বোঝায়। রামাদ্বান মাসে মুসলিমদের জন্য রোজা পালন ফরজ করা হয়েছে, যা আত্মিক এবং নৈতিক পরিশুদ্ধির এক মহান পন্থা। এই মাসে ইবাদত, তাওবা, এবং তাকওয়া চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটি আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এক অনন্য সময়।

রামাদ্বানের সূচনা এবং প্রথম রোজা

ইসলামের ইতিহাসে রামাদ্বানের সূচনা হয় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের ২য় হিজরির শাবান মাসে। এর পর থেকে এই মাসটি মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মাস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” (সুরা আল-বাকারা : ১৮৩) এই আয়াতের মাধ্যমে রামাদ্বানের রোজার বিধান প্রবর্তিত হয়, যা মুসলিম জীবনে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের একটি প্রধান স্তম্ভ।

রামাদ্বানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

রামাদ্বান মাস কেবল ইসলামে নয়, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অন্যান্য নবী ও রাসুলদের সময়েও রোজা পালনের বিধান ছিল। আল্লাহ বলেন, “যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল।” (সুরা আল-বাকারা : ১৮৩)

হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরাও রোজা রাখতেন। তবে ইসলামের রোজার বিশেষত্ব হলো, এটি নির্দিষ্ট দিনে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পালিত হয়। ইসলামে রোজার বিধান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে।

রামাদ্বানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

রামাদ্বানের সূচনা থেকেই এই মাসটি ছিল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একটি সময়। এটি এমন একটি মাস, যখন কুরআনুল কারিম নাজিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “রামাদ্বান সেই মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের সুস্পষ্ট দলিল।” (সুরা বাকারা : ১৮৫) কুরআন নাজিলের মাধ্যমে রামাদ্বানের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মাসে মুসলমানরা কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং এর শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন।

রামাদ্বানের সূচনা এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং তাকওয়া অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই মাস কেবল রোজা পালনের সময় নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে একটি নতুন জীবনের সূচনা করার সুযোগ। রামাদ্বান আমাদের শিখায় কীভাবে একজন প্রকৃত মুসলিম হয়ে উঠতে হয় এবং কীভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

রামাদ্বানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

রামাদ্বান মাস মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনন্য দান। এটি এমন একটি মাস যা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান সুযোগ। রামাদ্বানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো :

১. কুরআন নাজিলের মাস

রামাদ্বানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কুরআন নাজিলের মাস।

লাইলাতুল কদর :

কুরআন একসঙ্গে লাইলাতুল কদরে দুনিয়ার আকাশে নাজিল হয়। লাইলাতুল কদর এমন একটি রাত, যা হাজার মাসের থেকেও উত্তম।

আল্লাহ বলেন, "ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কদর।" "আমি কুরআন লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি।" (সুরা আল-কদর : ১)

এই রাত আল্লাহর রহমত এবং মাগফিরাত পাওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রামাদ্বানে কুরআন তিলাওয়াত :

রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাদ্বান মাসে হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর সাথে কুরআনের তিলাওয়াত করতেন। হাদিসে বলা হয়েছে, "রাসুল (সা.) জিব্রাইলের সাথে প্রতি রামাদ্বানে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর ইন্তেকালের বছরে এটি দুইবার করা হয়" (সহিহ বুখারি : ৪৯৯৮)। এ থেকে বোঝা যায়, রামাদ্বান মাসে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

২. সিয়ামের মাস

রামাদ্বানে রোজা রাখা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং এটি মুসলমানদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম

আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, ..., যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সুরা আল-বাকারা : ১৮৩)

রোজার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আরও নিবেদিত হয়।

রোজার ফজিলত : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে রোজা রাখে ঈমান এবং প্রতিদানের আশায়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে" (সহিহ বুখারি : ৩৮)। এটি রামাদ্বানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যা রোজাদারদের আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

৩. তারাবিহ এবং কিয়ামুল্লাইল

রামাদ্বানের রাতগুলো বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। তারাবিহ নামাজ এবং কিয়ামুল্লাইলের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদতে রত হন।

তারাবিহ নামাজ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রামাদ্বানের রাতে ঈমান সহকারে ইবাদত করে, তার সমস্ত পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।" (সহিহ বুখারি : ১৯০১)

৪. দান-সদকা এবং ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

রামাদ্বান দানের মাস। এই মাসে মানুষের প্রতি উদারতা এবং দানের শিক্ষা দেওয়া হয়।

দান ও উদারতার উদাহরণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রামাদ্বানে রাসুলুল্লাহ (সা.) দানে এত উদার হতেন যে, এটি প্রবাহমান বাতাসকেও হার মানাত।" (সহিহ বুখারি) রামাদ্বানে দানের মাধ্যমে সমাজের গরিব এবং অসহায় মানুষদের সাহায্য করা হয়, যা ইসলামের একটি মূলনীতি।

৫. দুআ এবং যিকিরের মাস

রামাদ্বান বিশেষ দুআ কবুলের মাস।

দুআর ফজিলত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির দুআ কখনো ফেরত দেওয়া হয় না– ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার এবং মজলুম" (তিরমিজি)। এই মাসে মানুষ আল্লাহর কাছে নিজের জন্য এবং সমগ্র উম্মাহর জন্য দুআ করে।

৬. লাইলাতুল কদরের রাত

লাইলাতুল কদর হলো রামাদ্বানের সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ রাত।

লাইলাতুল কদরের ফজিলত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমান সহকারে ইবাদত করে, তার সমস্ত পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়" (সহিহ বুখারি : ১৯০১)। এই রাতটি আমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামত এবং বরকতের উৎস।

৭. জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রামাদ্বানের সময় জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়" (সহিহ বুখারি : ১৮৯৯; সহিহ মুসলিম : ১০৭৯)। এটি আমাদের জানিয়ে দেয় যে, এই মাসে আল্লাহর রহমত ও বরকত অর্জনের সুযোগ আরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

৮. রামাদ্বান : পাপমুক্তির মাস

রামাদ্বান পাপমুক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সুযোগ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রামাদ্বানের প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির" (বায়হাকি)। এই মাসে তাওবা এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের পাপ মুছে ফেলার সুযোগ পাই।

৯. দ্বিগুণ পুরস্কার

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, সে রোজাদারের সমান পুরস্কার পাবে, তার সওয়াবে কোনো কমতি হবে না" (তিরমিজি)। ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, "ইফতার করানোর অর্থ হলো এমন পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা যা রোজাদারকে তৃপ্ত করবে।" (আল-ইখতিয়ারাত, পৃষ্ঠা ১৯৪)

১০. দুটি আনন্দের মুহূর্ত

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রোজাদার দুইটি আনন্দ পাবে; একটি যখন সে ইফতার করে, অন্যটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে" (সহিহ বুখারি : ১৭৭১)। রামাদ্বান আমাদের শারীরিক, মানসিক, এবং আত্মিক উন্নতির জন্য একটি সুযোগ, যা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

১১. রোজার পুরস্কার আল্লাহ নিজেই দিবেন

রামাদ্বানের ফজিলত এবং এর উপকারিতা ইসলামি শিক্ষার মূল বিষয়। রামাদ্বান মাসে রোজা রাখার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোজা আমার জন্য, এবং আমি এর পুরস্কার নিজেই দেব" (সহিহ বুখারি : ১৭৬১; সহিহ মুসলিম : ১৯৪৬)। এখানে আল্লাহর বিশেষ ঘোষণা বুঝিয়ে দেয় যে, রোজার পুরস্কার আল্লাহ সরাসরি দিবেন। রোজা এমন একটি ইবাদত যা একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। মানুষ রোজা রাখলে তা প্রকাশ পায় না; একমাত্র আল্লাহ জানেন। এটি রিয়া মুক্ত হওয়ার এক নিদর্শন।

রামাদ্বানের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জীবনে তাকওয়া, সহমর্মিতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের গুণাবলি তৈরি করে। এই মাসে বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির সুযোগ পাই। রামাদ্বান কেবল রোজার মাস নয়, এটি আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার একটি মহৎ সুযোগ।

রামাদ্বান : কুরআন নাজিলের মাস

রামাদ্বান মাস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি অনন্য উপহার। এই মাসে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করেছেন, যা মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। রোজা একটি বিশেষ ইবাদত যা মানুষের আত্মিক উন্নতি, নৈতিকতার শুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম।

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, "রামাদ্বান মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথ নির্দেশনা এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী" (সুরা আল-বাকারা : ১৮৫)। রামাদ্বান শুধু রোজার মাস নয়, এটি কুরআনের মাস। এই মাসে কুরআন তিলাওয়াত, তার অর্থ বোঝা এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। রামাদ্বানের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং মানব কল্যাণে অবদান রাখা।

এই আলোচনায় আমরা কুরআনের আলোকে রামাদ্বান মাসের গুরুত্ব এবং রোজার শিক্ষা মানব জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করব। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কিভাবে রামাদ্বান আমাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করে তাকওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হয়, তা এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। রামাদ্বানের সঙ্গে আল-কুরআনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই মাসেই মানবজাতির জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান, আল-কুরআন নাজিল করা হয়েছে। এটি কেবল একটি গ্রন্থ নয়, বরং মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। কুরআনকে

"হেদায়াত" হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য সঠিক পথের দিশারী। এ আয়াতে আল্লাহ কুরআন এবং রামাদ্বানের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট করেছেন। কুরআন মানবজাতির নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। রামাদ্বানের সময় কুরআনের তিলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে কুরআন নাজিল

আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ওহি। হযরত জিব্রাইল (আ.) প্রথম ওহি হেরা গুহায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। প্রথম নাজিল হওয়া আয়াত ছিল, "পড়ুন, আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সুরা আলাক : ১)। এই আয়াত কেবল কুরআনের সূচনা নয়, বরং মানবজাতির জ্ঞানার্জনের অনুপ্রেরণা। কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কুরআনের বিভিন্ন নাম এবং তাদের অর্থ

আল-কুরআনের বিভিন্ন নাম রয়েছে যা তার বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এই নামগুলো কুরআনের অনন্যতা এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝায়।

১. আল-কুরআন (পাঠযোগ্য গ্রন্থ)

কুরআন শব্দটি এসেছে "কারা'আ" (পড়া) থেকে, যার অর্থ হলো পাঠ করা বা তিলাওয়াত করা। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা পঠন ও অধ্যয়নের জন্য এবং মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য নাজিল হয়েছে।

২. আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)

আল্লাহ বলেন, "অত্যন্ত বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে জগৎবাসীকে সতর্ক করতে পারে" (সুরা আল-ফুরকান : ১)। কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়।

৩. আন-নূর (আলোর দিশা)

আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলো পাঠিয়েছি যা তোমাদের পরিষ্কার পথ দেখায়" (সুরা আন-নিসা : ১৭৪)। কুরআন এমন একটি আলো যা মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা প্রদান করে এবং মানুষকে আল্লাহর রহমতের পথে পরিচালিত করে।

৪. শিফা (আরোগ্য)

আল্লাহ বলেন,"আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করেছি যা আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য রহমত" (সুরা আল-ইসরা : ৮২)। কুরআন মুমিনদের জন্য মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক আরোগ্যের উৎস। এটি পাপমুক্ত জীবনযাপনে সাহায্য করে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করার পথ দেখায়।

৫. হুদা (সঠিক পথের দিশা)

আল্লাহ বলেন,"এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি তাদের জন্য হেদায়াত যারা তাকওয়াবান।" (সুরা আল-বাকারা : ২) কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানবজাতির জন্য সঠিক পথের দিশা। এটি আল্লাহর নির্দেশনার উৎস এবং মানবজীবন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

৬. আহসানুল কাসাস (সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি)

আল্লাহ বলেন,"আমরা তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনি বর্ণনা করছি এই কুরআনের মাধ্যমে।" (সুরা ইউসুফ : ৩) কুরআনে বর্ণিত কাহিনিগুলো শুধু ইতিহাস নয়, বরং এগুলো থেকে জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। বিশেষত, সুরা ইউসুফে বর্ণিত কাহিনি ধৈর্য, ক্ষমা এবং আল্লাহর ওপর আস্থার গুরুত্ব প্রকাশ করে। রামাদ্বানের সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ক মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের নামগুলো যেমন তার গুণাবলিকে প্রকাশ করে, তেমনই এই পবিত্র মাস কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং জীবনে বাস্তবায়নের একটি সুবর্ণ সুযোগ। রামাদ্বানের সময় আমরা কুরআনকে আলোর উৎস, হেদায়াতের দিশা এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এভাবে কুরআন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ দেয়।

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য : মানবজাতির জন্য হেদায়েত

কুরআনের মূল লক্ষ্য এবং দিক নির্দেশনা

আল-কুরআন নাজিল হয়েছে মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। এটি কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়; বরং এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা এবং শিক্ষা প্রদান করে। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা। আল্লাহ বলেন,

"الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ"

"আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি যাতে আপনি জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন।" (সুরা ইবরাহীম : ১)

১. হেদায়েত পথ প্রদর্শন

কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে সত্যের পথে পরিচালিত করা। এটি সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং মানুষকে নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ বলেন, "এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি তাদের জন্য হেদায়াত যারা তাকওয়াবান"(সুরা আল-বাকারা : ২)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে কুরআন শুধু মুমিনদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য সঠিক পথের দিশারী। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর হুকুম পালন করে, তারা এ থেকে সর্বোচ্চ উপকৃত হয়।

২. মানবজাতিকে আলোর পথে নিয়ে আসা

কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করা। এটি অজ্ঞতা, পাপ এবং বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ দেখায়। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন" (সুরা আল-বাকারা : ২৫৭)। কুরআনের আলো মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এটি এমন এক আলোকিত পথ, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুশৃঙ্খলতা এবং শান্তি নিয়ে আসে।

৩. তাওহিদ বার্তা প্রচার

কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তাওহিদ বা একত্ববাদের বার্তা প্রচার। এটি মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করতে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক" (সুরা আল-ইখলাস : ১)। তাওহিদের এই বার্তা মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে শেখায় এবং অন্য কোনো সত্তার প্রতি উপাসনা করা থেকে বিরত রাখে।

৪. নৈতিকতার উন্নয়ন

কুরআন মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য নাজিল হয়েছে। এটি মানুষকে সৎ, ধৈর্যশীল এবং দয়ালু হতে শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম নৈতিকতা সম্পূর্ণ করার জন্য।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) কুরআনের নৈতিক শিক্ষা সমাজে শান্তি, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

৫. জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা

কুরআন কেবল ধর্মীয় ইবাদতের দিকনির্দেশনা দেয় না, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক-পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম।" (সুরা আল-মায়িদা : ৩)

৬. আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা

কুরআনের আরেকটি মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আখিরাত বা পরকালের জন্য প্রস্তুত করা। এটি মানুষকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত হতে বলে এবং নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে"(সুরা আল-জিলজাল : ৭)। আল-কুরআন একটি চিরন্তন দিকনির্দেশনা যা মানুষের জন্য অন্ধকার থেকে আলোর পথপ্রদর্শক। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। কুরআনের শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য আবশ্যক, কারণ এটিই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন তিলাওয়াত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা মুমিনের জীবনে অনন্য মর্যাদা ধারণ করে। এটি শুধু ইবাদত নয়, বরং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক উন্নয়ন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম। কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব কুরআন ও হাদিসে বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১. তিলাওয়াতের অগণিত সওয়াব

কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি বর্ণের জন্য সওয়াব রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে, সে এর জন্য একটি সওয়াব পাবে। আর প্রতিটি সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।" (তিরমিজি : ২৯১০) এই হাদিসে কুরআনের প্রতিটি বর্ণ তিলাওয়াতের অপরিসীম ফজিলত বোঝানো হয়েছে। এমনকি "আলিফ-লাম-মীম" বললেও তিনটি বর্ণের জন্য আলাদা সওয়াব পাওয়া যায়।

২. কুরআন মুখস্থ করার ফজিলত

কুরআন মুখস্থ করা মুমিনের জীবনে অনন্য মর্যাদা নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা মুখস্থ করে, সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে" (সহিহ বুখারি : ৫০২৭)। কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে একজন মুমিন

আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে। তারা কিয়ামতের দিন সম্মানিত অবস্থানে থাকবে এবং তাদের জন্য জান্নাতে বিশেষ পুরস্কার থাকবে।

৩. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি

কুরআন তিলাওয়াত অন্তরের অশান্তি দূর করে এবং মনকে সান্ত্বনা দেয়। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জীবনে সংকীর্ণতা থাকবে" (সুরা ত্বহা : ১২৪)। তিলাওয়াত আল্লাহর স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি মানুষের জীবনে প্রশান্তি ও স্থিতি এনে দেয় এবং বিপদের সময় শক্তি জোগায়।

৪. তিলাওয়াতকারীদের বিশেষ মর্যাদা

কুরআন তিলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তার পিতামাতাকে এমন মুকুট পরিয়ে দেবেন, যা সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল" (আবু দাউদ)। এই হাদিসে বোঝা যায়, কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত কেবল ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার পিতামাতার উপরও এই ফজিলত ছড়িয়ে পড়ে।

৫. কুরআন শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়" (সহিহ বুখারি : ৫০২৭)। এই হাদিসে কুরআন শেখা ও শেখানোর গুরুত্বকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এটি এমন একটি ইবাদত যা ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে এবং সমাজে নৈতিকতার উন্নতি ঘটায়।

৬. কুরআন তিলাওয়াত এবং কিয়ামতের সাক্ষাৎ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কুরআন কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম : ৮০৪)

এই হাদিসে কুরআন তিলাওয়াতের আধ্যাত্মিক দিকটি স্পষ্ট করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কুরআন নিজেই তার পাঠকারীর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।

৭. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা

কুরআন তিলাওয়াত মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। আল্লাহ বলেন, "এই কিতাবের মধ্য দিয়ে আমি মানুষের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছি" (সুরা আল-কাহাফ : ৫৪)। তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করার অনুপ্রেরণা পায়।

কুরআন তিলাওয়াত একটি পবিত্র ইবাদত, যা মানুষের জীবনে শান্তি, সওয়াব এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ে আসে। এটি একদিকে যেমন আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, তেমনি অন্যদিকে মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা। তাই আমাদের উচিত কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং এর শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করা।

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু

আল-কুরআন মানবজাতির জন্য সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ বিধান, যা মানুষের জীবন পরিচালনার দিশা দেখায়। এটি কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। কুরআনের মূল বিষয়বস্তু বিভিন্ন আয়াতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে কুরআনের মূল বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. তাওহিদ : এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা কুরআনের মূল ভিত্তি। এটি কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর ফেরেশতা এবং জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী ছাড়া অন্য কেউ নন। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সুরা আল-ইমরান : ১৮)। তাওহিদের মূল বিষয় হলো, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল সৃষ্টি ও উপাসনার একমাত্র উপযুক্ত এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।

২. রিসালাত : নবী ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস

নবী ও রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে হেদায়াত নিয়ে আসা দূত। রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারা শেষ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,"তোমাদের কাছে আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন" (সুরা আল-বাকারা : ১৫১)। নবীগণের পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান জানানো এবং তাদের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত করা।

৩. আখিরাত : পরকালীন জীবনের বিশ্বাস

কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আখিরাত বা পরকাল। এটি মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

আল্লাহ বলেন, “তারা বলে, ‘আমরা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে কি পুনরুত্থিত হব?’ প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের রবের সাক্ষাত অস্বীকার করে” (সুরা আস-সাজদা : ১০)। পরকালীন জীবনে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের জীবনে দায়িত্বশীলতা নিয়ে আসে।

৪. শারিয়াহ : আইন ও বিধান

কুরআন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেয়। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন ও বিধান রয়েছে।

আল্লাহ বলেন,“আমি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারো।” (সুরা আন-নিসা : ১০৫) কুরআনে ইবাদত, লেনদেন, বিবাহ, তালাক, এবং দণ্ডবিধির মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ নির্দেশনা রয়েছে।

৫. ইবাদাত : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ উপাসনা

কুরআন মানুষকে সঠিকভাবে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়। ইবাদত মানে শুধু নামাজ, রোজা নয়, বরং প্রতিটি ভালো কাজই ইবাদত। আল্লাহ বলেন, “হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো” (সুরা আল-বাকারা : ২১)। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আত্মিক শুদ্ধি অর্জন করে।

৬. হিদায়াত : সঠিক পথে পরিচালিত করা

কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে হেদায়াত বা সঠিক পথে পরিচালিত করা। আল্লাহ বলেন,“এটি একটি কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারো।” (সুরা ইবরাহীম : ১) কুরআন মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয় এবং তাদের ভুল থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসে।

৭. নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ

কুরআন মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলী তৈরি করে এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা ন্যায়ের আদেশ দাও এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখো” (সুরা আল-ইমরান : ১১০)। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী, সততা, ধৈর্য, সহমর্মিতা এবং দায়িত্বশীলতা সমাজে শান্তি এবং স্থিতি প্রতিষ্ঠা করে।

৮. ইতিহাস এবং উদাহরণ

কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ইতিহাস এবং তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার উদাহরণ রয়েছে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, “আমি তাদের কাহিনীগুলো তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো” (সুরা হুদ : ১২০)। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাহিনী মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কুরআন মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়। এটি শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে মানবজীবন সফল এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

কুরআন নাজিলের ধারা : একটি ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া

আল-কুরআন সম্পূর্ণ একসাথে নাজিল হয়নি, বরং এটি তেইশ বছরের দীর্ঘ সময়ে ধাপে ধাপে নাজিল হয়েছে। এই ধীরে ধীরে নাজিল করার মধ্যে গভীর প্রজ্ঞা এবং মানবজাতির জন্য এক মহান শিক্ষা রয়েছে।

১. ধীরে ধীরে নাজিলের কারণ

কুরআন ধাপে ধাপে নাজিল করার পেছনে অন্যতম কারণ হলো মানুষের পক্ষে এটি গ্রহণ করা সহজ করা এবং তাদের জীবনধারায় তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

আল্লাহ বলেন, “وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا”

“আমি এই কুরআনকে ধাপে ধাপে পাঠ করেছি, যাতে আপনি এটি মানুষের সামনে ক্রমান্বয়ে তিলাওয়াত করতে পারেন।” (সুরা আল-ইসরা : ১০৬)

এটি একসঙ্গে নাজিল হলে মানুষের পক্ষে তা পুরোপুরি বোঝা এবং অনুসরণ করা কঠিন হতো। ধাপে ধাপে নাজিল হওয়ায় মানুষ এক একটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।

২. মুসিবতে সাহস ও শক্তি জোগানো

রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা দাওয়াহর পথে নানা বাধাবিপত্তি, নির্যাতন এবং মানসিক চাপের মুখোমুখি হতেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তাঁদের সাহস জোগাত এবং কঠিন পরিস্থিতিতে মানসিক শক্তি দিত। আল্লাহ বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

“আমি রাসুলদের বাণী থেকে কিছু কিছু আপনাকে শোনাই যাতে আপনার হৃদয় দৃঢ় হয়।” (সুরা হুদ : ১২০)

এ আয়াতে দেখা যায়, পূর্ববর্তী রসূলদের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মনোবল দৃঢ় করা হয়েছে। এটি শুধু রাসুলুল্লাহ (সা.) নয়, বরং তাঁর অনুসারীদের জন্যও শিক্ষা এবং উৎসাহের উৎস।

৩. সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান

ধাপে ধাপে নাজিলের আরেকটি কারণ হলো, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দেওয়া। প্রতিটি নতুন ঘটনা, সমস্যা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক সমাধান দিত। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“তারা তোমার কাছে যা কিছু নিয়ে আসুক না কেন, আমি তার উত্তর সঠিক এবং উত্তম ব্যাখ্যা সহ প্রদান করি।” (সুরা আল-ফুরকান : ৩৩)

এ পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর জন্য দাওয়াহ এবং জীবন পরিচালনায় একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৪. তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের সুযোগ বৃদ্ধি

ধীরে ধীরে নাজিল হওয়ার ফলে সাহাবারা (রা.) এক একটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তা মুখস্থ করতেন এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করতেন। এটি কুরআন শিক্ষা এবং আমলের একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।” (সহিহ বুখারি : ৫০২৭)

৫. ধৈর্য ও সবরের প্রশিক্ষণ

কুরআন ধাপে ধাপে নাজিলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ধৈর্য এবং সবর শেখার সুযোগ পেয়েছে। আয়াতগুলো ধীরে ধীরে নাজিল হওয়ার ফলে মুসলিমরা প্রতিটি নির্দেশনা ও শিক্ষাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আল্লাহ বলেন, “আর ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারীদের সঙ্গে আছেন।” (সুরা আল-বাকারা : ১৫৩)

কুরআনের ধাপে ধাপে নাজিল হওয়া মহান আল্লাহর অপার প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। এটি মানুষের জীবনে সহজবোধ্যতা, অনুপ্রেরণা এবং সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান করেছে। ধীরে ধীরে নাজিল হওয়ার ফলে মুসলিম উম্মাহ কুরআনের শিক্ষা গ্রহণে ধৈর্যশীল হয়েছে এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছে। আল-কুরআন আজও মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান হিসেবে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

কুরআনের গল্প ও রামাদ্বানের শিক্ষা

রামাদ্বান মাস কুরআনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই মাসে কুরআনের তিলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং জীবনে তা প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা, ধৈর্য, তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। কুরআনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক গল্প রামাদ্বানের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করে তোলে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বর্ণনা করা হলো।

হযরত মূসা (আ.) ও ফিরাউনের ঘটনা

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং তাওহিদের শক্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ফিরাউন ও তার সৈন্যদের অত্যাচারের মুখেও মূসা (আ.) আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রাখেন। আল্লাহ যখন মূসাকে সমুদ্র আঘাত করতে নির্দেশ দেন, তখন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে পাড়ি দেন।

আল্লাহ বলেন,

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

“তখন আমি মূসাকে ওহি করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত কর। তখন তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং প্রতিটি অংশ পাহাড়ের মতো হয়ে গেল।” (সুরা আশ-শু'আরা : ৬৩)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা : রামাদ্বান মাস আমাদের শেখায় যে, প্রতিটি পরীক্ষায় আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করলে আমরা সফল হব।
- অত্যাচারীদের পরাজয় : যারা অন্যায় করে, তাদের পরিণাম কী হতে পারে, তা এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্যের গল্প

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবন কাহিনী ধৈর্য এবং তাকওয়ার এক অপূর্ব উদাহরণ। তিনি তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্র, কারাবাস এবং নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনো আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারাননি এবং সবসময় ন্যায়ের পথে অটল ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তার প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।” (সুরা ইউসুফ : ৯০)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- ধৈর্যের গুরুত্ব : রামাদ্বান মাস ধৈর্যচর্চার একটি উত্তম সময়।

এটি আমাদের শেখায় যে, কঠিন সময়েও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে।

- তাকওয়ার পথ : যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর বিধান মেনে চলে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং দেন।

হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর জাতির ঘটনা

হযরত নূহ (আ.)-এর গল্প আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য কী কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তারা অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের উপর কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

"আমি নূহ এবং তার অনুসারীদের নৌকাসহ রক্ষা করেছিলাম এবং এটিকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছি।" (সুরা আনকাবুত : ১৫)

রামাদ্বানের শিক্ষা:

- আল্লাহর নির্দেশ মানার গুরুত্ব : আল্লাহর আদেশকে মেনে চলার শিক্ষা আমরা এই ঘটনা থেকে পাই।
- নির্ভীক দাওয়াত : সত্য প্রচারে দৃঢ় থাকতে হবে, যদিও প্রতিকূলতা থাকে।
- কুরআনের অন্যান্য গল্পের শিক্ষার আলোকে রামাদ্বানের গুরুত্ব

হযরত ইবরাহিম (আ.)

তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর সন্তানের কুরবানি দিতে প্রস্তুত হন। রামাদ্বানে আমরা তাঁর ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

হযরত আইউব (আ.)

রোগ-ব্যাধির মধ্যে ধৈর্যের এক অনন্য উদাহরণ। রামাদ্বান মাস আমাদের ধৈর্যশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনের প্রতিটি ঘটনা আমাদের জীবনের জন্য একটি নিদর্শন। রামাদ্বান মাস কুরআনের এই শিক্ষাগুলো উপলব্ধি করার, তা নিয়ে চিন্তা করার এবং তা আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের সময়। কুরআনের গল্পগুলো থেকে আমরা ধৈর্য, তাকওয়া, বিশ্বাস, এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি অর্জন করতে পারি।

রামাদ্বান ও আত্মশুদ্ধি : কুরআনের নির্দেশনা

রামাদ্বান মাস আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য সুযোগ। এই মাসে মুমিনগণ নিজেদের পাপ থেকে মুক্ত করার এবং তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারেন। কুরআনের নির্দেশনাগুলো আত্মশুদ্ধির এই প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়তা করে। রামাদ্বানের লক্ষ্য হলো মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, যা তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

তাওবা ও ইস্তিগফারের মাস

রামাদ্বান হলো তাওবা ও ইস্তিগফারের জন্য সর্বোত্তম সময়। কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সর্বদা পাপ ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত। পাপ থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আত্মা পবিত্র হয়।আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

"আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?" (সুরা আলে ইমরান : ১৩৫)

রামাদ্বান মাসে বেশি বেশি ইস্তিগফার এবং দোয়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মতো, যে কোনো পাপই করেনি।" (ইবনু মাজাহ : ৪২৫০)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- নিজের পাপের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করা।
- বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তাওবার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা।

তাকওয়ার পথে চলার নির্দেশনা

রামাদ্বান মাসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া হলো আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। কুরআন আমাদের নির্দেশ দেয় আল্লাহকে ভয় করতে এবং সৎ ও সত্যবাদীদের সঙ্গ গ্রহণ করতে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎদের সঙ্গী হও।" (সুরা আত-তাওবা : ১১৯)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- সত্যের পথে থাকা এবং সৎ আচরণ করা।
- আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে প্রতিদিনের কাজগুলোতে তাকওয়ার অনুশীলন করা।
- নিজের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত করার মাধ্যমে আত্মাকে

শুদ্ধ করা।

পাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বান

রামাদ্বান মাসে কুরআনের বার্তাগুলো আমাদের পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোজা রাখে কিন্তু মিথ্যা কথা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে না, তার রোজা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।" (সহিহ বুখারি : ১৯০৩)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- নিজের জিহ্বা, চোখ, কানে এবং হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং সৎকর্মে মনোনিবেশ করা।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যম : ইবাদত এবং দানশীলতা

রামাদ্বান মাসে ইবাদত যেমন নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, এবং দানশীলতার মাধ্যমে আত্মাকে শুদ্ধ করা যায়। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি সামান্য সৎকর্ম করে, সে তার প্রতিদান পাবে।" (সুরা আল-যিলজাল : ৭)

রামাদ্বানের শিক্ষা :

- দানশীলতার চর্চা এবং গরিবদের সাহায্যের মাধ্যমে আত্মাকে নম্র করা।
- বেশি বেশি ইবাদত এবং কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা।

রামাদ্বান মাস আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের চর্চার একটি সুবর্ণ সময়। কুরআনের নির্দেশনাগুলো আমাদের এই মহিমান্বিত মাসে তাকওয়া অর্জন এবং নৈতিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে। পাপ থেকে মুক্ত থাকা, ইবাদত ও দানশীলতায় মনোনিবেশ করা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করা রামাদ্বানের অন্যতম শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে।

রামাদ্বানের ঐতিহাসিক ঘটনা : বর্তমান প্রেক্ষাপট

রামাদ্বান মাস শুধু ইবাদতের মাস নয়; এটি ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনায় সমৃদ্ধ। ইসলামের প্রথম যুগে সংঘটিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– বদর যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়– আমাদেরকে রামাদ্বানের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে এই ঘটনাগুলোর তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে, কারণ এগুলো মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সামগ্রিক জীবনধারায় শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

১. বদর যুদ্ধ : মুসলমানদের প্রথম বিজয়

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

রামাদ্বানের ১৭ তারিখে ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান সামান্য সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে মক্কার কুরাইশ বাহিনীর ১,০০০ জনের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।" (সুরা আলে ইমরান : ১২৩)

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বদর যুদ্ধের শিক্ষা হলো, সংকটময় মুহূর্তে ধৈর্য, ইমান এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে বিজয় আসবেই। বর্তমান সময়ে মুসলমানরা অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে– সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। বদর যুদ্ধের উদাহরণ থেকে আমরা শিখি যে, আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করলে, ছোট সংখ্যালঘু দলও বিশাল শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। এটি আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

২. মক্কা বিজয় : ইসলামের সর্বোচ্চ সাফল্য

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

রামাদ্বান মাসে ৮ম হিজরির সময় মুসলমানরা মক্কা বিজয় করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করে। তারা তাদের শত্রুদের ক্ষমা করে দেন, যা মানবতার প্রতি ইসলামের উদারতা এবং সহমর্মিতার এক অনন্য উদাহরণ। এটি ইসলামের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আজকের দিনে তোমাদের প্রতি আমার কোনো প্রতিশোধ নেই। তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করা হলো।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

বর্তমান প্রেক্ষাপট

মক্কা বিজয়ের শিক্ষা হলো ক্ষমা, সহমর্মিতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভাজন, সহিংসতা এবং বৈষম্যের কারণে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মক্কা বিজয়ের ঘটনা আমাদের শেখায়, প্রতিশোধ নয়, বরং ক্ষমা এবং ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে সত্যিকারের বিজয় অর্জন সম্ভব।

ঐতিহাসিক ঘটনার বর্তমান প্রভাব

বদর যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের ঘটনা শুধু ইতিহাস নয়; এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। বর্তমান সময়ে, যখন মুসলমানরা নৈতিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন এই ঘটনাগুলো আমাদের একতা, দৃঢ়তা এবং আল্লাহর উপর ভরসার শিক্ষা দেয়। রামাদ্বান আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর পথে চলতে সাহস ও ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্য এবং কুরআনের নির্দেশনায়, আমরা আমাদের জীবনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারি এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

রামাদ্বান মাসের শিক্ষাগুলো

রামাদ্বান মাস মুসলিম জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটি শুধু রোজা রাখা বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার মাস নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন, ইবাদতের প্রতি গভীর মনোযোগ এবং মানুষের প্রতি উদারতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা গ্রহণের একটি বিশেষ সুযোগ। রামাদ্বান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জন

রামাদ্বানের মূল লক্ষ্য হলো তাকওয়া অর্জন (সুরা আল-বাকারা : ১৮৩)। রোজার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারে। তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারি এবং পাপ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্টের মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের কষ্ট অনুভব করার শিক্ষা আমরা রোজার মাধ্যমে পাই, যা আমাদের মধ্যে সহানুভূতি ও দানশীলতার গুণাবলি তৈরি করে।

কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি

রামাদ্বান হলো কুরআন নাজিলের মাস। এই মাসে কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তার পাঠ, অধ্যয়ন ও উপলব্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, "রামাদ্বান সেই মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী" (সুরা আল-বাকারা : ১৮৫)। মুসলমানরা রামাদ্বানে তারাবি নামাজে কুরআনের তিলাওয়াত শোনেন এবং এর মাধ্যমে তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করেন। কুরআনের পাঠ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর পথনির্দেশনা গ্রহণে সহায়ক হয়।

ইবাদতে মনোনিবেশ

রামাদ্বান মাস ইবাদত করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করে। তারাবি, তাহাজ্জুদ, দোয়া এবং যিকির এই মাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রোজা রাখে এবং রাতে ইবাদত করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে" (সহিহ বুখারি : ৩৮)। এই ইবাদত আমাদের আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

পাপ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা

রামাদ্বান হলো পাপ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের সময়। এটি আমাদের শিখায় কিভাবে পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং পাপ কাজ ত্যাগ করতে পারে না, তার রোজা রাখার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই" (সহিহ বুখারি : ১৯০৩)। রামাদ্বানে আমরা শুধু খাবার ও পানীয় থেকে নয়, বরং মিথ্যা, পাপ এবং অশালীন কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখার চেষ্টা করি।

সম্প্রীতি ও উদারতা বৃদ্ধি

রামাদ্বান আমাদের মধ্যে উদারতা এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির শিক্ষা দেয়। এই মাসে দান-সদকা, জাকাত ও ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য রোজাদারের সমান সওয়াব রয়েছে" (তিরমিজি : ৮০৭)। রামাদ্বান আমাদের হৃদয়ে সহমর্মিতা, উদারতা এবং দায়িত্বশীলতার গুণাবলি তৈরি করে।

লাইলাতুল কদরের শিক্ষা

রামাদ্বানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি হাজার মাসের থেকেও উত্তম একটি রাত। আল্লাহ বলেন, "লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম" (সুরা আল-কদর : ৩)। এই রাত আমাদের শিখায় কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা

রামাদ্বান আমাদের ধৈর্য ধারণ এবং সংযমের শিক্ষা দেয়। রোজার মাধ্যমে আমরা শারীরিক ও মানসিক সংযম অনুশীলন

করি। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য তাদের প্রতিদান কোনো হিসাব ছাড়াই দেওয়া হবে।" (সুরা আজ-জুমার : ১০)। এই ধৈর্য আমাদের প্রতিদিনের জীবনে মনোযোগী এবং স্থির হতে সাহায্য করে।

দানশীলতা এবং উদারতা

রামাদ্বান দানশীলতার মাস। এই মাসে মুসলমানরা জাকাত আদায়, দান-সদকাহ এবং ইফতার করানোর মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, সে রোজাদারের সমান সওয়াব পাবে, তার সওয়াবে কোনো কমতি হবে না" (তিরমিজি : ৮০৭)। দানশীলতা আমাদের হৃদয়ে উদারতা এবং দায়িত্ববোধ তৈরি করে। এটি সমাজের প্রয়োজনমতো সাহায্য পৌঁছে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

লাইলাতুল কদরের শিক্ষা

রামাদ্বানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর খুঁজে পাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি হাজার মাসের থেকেও উত্তম। আল্লাহ বলেন, "লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম" (সুরা আল-কদর : ৩)। এই রাত আমাদের শিখায় কীভাবে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হওয়া যায় এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। এই রাতের ইবাদত আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের একটি সুবর্ণ সুযোগ।

তাওবার সুযোগ

রামাদ্বান পাপমুক্তির মাস। এটি এমন একটি সময় যখন আল্লাহ আমাদের তাওবা করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে মুক্তির সুযোগ দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রামাদ্বানের প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির" (বায়হাকি)। রামাদ্বানে তাওবা এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের পাপ দূর করতে পারি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। রামাদ্বান আমাদের জীবনে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও নির্ভরশীলতার একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে। এই মাসে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করে।

সম্প্রীতি ও উদারতা বৃদ্ধি

রামাদ্বান আমাদের শেখায় কীভাবে পরিবার, সমাজ এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হয়। এই মাসে দান-সদকাহ, জাকাত আদায় এবং অসহায় মানুষদের সাহায্য করার মাধ্যমে উদারতা চর্চা করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য রোজাদারের সমান সওয়াব রয়েছে" (তিরমিজি : ৮০৭)। রামাদ্বান আমাদের পরিবার এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক মজবুত করে। এটি আমাদের হৃদয়ে উদারতা, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। রামাদ্বান মাস কেবল রোজার সময় নয়; বরং এটি হলো আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন, ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ এবং সমাজে উদারতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাস। এই মাসে অর্জিত শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য রামাদ্বান একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

রামাদ্বান : পাপ থেকে মুক্তির সময়

রামাদ্বান মাসকে বলা হয় পাপ মুক্তির মাস। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রামাদ্বানের রোজা রাখে ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশায়, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে" (সহিহ বুখারি : ৩৮)। রামাদ্বান মাসে সৎকাজের প্রতি উৎসাহ এবং পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষ বিশেষভাবে চেষ্টা করে। এটি মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি আরও নিকটবর্তী করে তোলে।

রামাদ্বানের মহিমা ও গুরুত্ব

রামাদ্বান একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের মাস যা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া, এবং আল্লাহর কাছে নৈকট্য লাভের জন্য একটি স্বর্ণালী সুযোগ। এটি আমাদের কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ায়, দানশীলতা শেখায় এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন, "ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম ওয়ালা'আল্লাকুম তাশকুরুন।" "যেন তোমরা আল্লাহর বড়োত্ব ঘোষণা করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।" (সুরা আল-বাকারা : ১৮৫)

গুনাহ মাফ পাওয়ার মাধ্যম

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

- "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রামাদ্বানের রোজা রাখে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারি :২০১৪, সহিহ মুসলিম : ৭৬০)
- "এক রামাদ্বান থেকে পরবর্তী রামাদ্বান পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, যদি বড়ো গুনাহ এড়িয়ে চলা হয়।" (সহিহ মুসলিম : ২৩৩)

ধৈর্য ও স্থিরতা অর্জন

রামাদ্বানের রোজা ধৈর্য এবং স্থিরতা বাড়ায়। এটি আমাদের শক্ত ইচ্ছাশক্তি তৈরি করে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের

আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা এবং ধৈর্যের অনুশীলন করা উচিত, যাতে রমজানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় সহজে সহ্য করা যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো রমজানের জন্য একটি সময়সূচি তৈরি করা। এর মধ্যে থাকবে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, কুরআন তিলাওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ, এবং দান-সদকার পরিকল্পনা। এছাড়া, আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করা, যাতে রমজানের সময় ইবাদতে পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়।

জন্য তাদের প্রতিদান কোনো হিসাব ছাড়াই দেওয়া হবে।" (সুরা আজ-জুমার, : ১০)

লাইলাতুল কদর সন্ধান

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কাছে রামাদ্বান এসেছে, এটি বরকতময় মাস। আল্লাহ এই মাসে রোজা রাখাকে ফরজ করেছেন। এতে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং বিদ্রোহী শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এতে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সত্যিই বঞ্চিত।" (নাসায়ি : ২১০৬; আহমাদ : ৮৭৬৯)

রিয়া থেকে মুক্তি ও ইখলাস অর্জন

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, তবে রোজা আমার জন্য এবং আমি এর পুরস্কার দেব" (সহিহ বুখারি : ১৭৬১ ও সহিহ মুসলিম : ১৯৪৬)। ইবনে কুরতুবি বলেন, "রোজা একটি এমন ইবাদত যা শুধু আল্লাহ জানেন। এটি অন্যদের কাছে প্রকাশ হয় না, তাই আল্লাহ এটি নিজস্ব বলে ঘোষণা করেছেন।"

চরিত্র গঠন ও সত্যবাদিতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং পাপ কাজ ত্যাগ করতে পারে না, আল্লাহ তার খাবার ও পানীয় ত্যাগ করার প্রয়োজন রাখেন না" (সহিহ বুখারি : ১৯০৩)।

খাদ্য ও পানীয় নিয়ন্ত্রণ শেখানো

রামাদ্বানের রোজা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাহায্য করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একজন শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের তুলনায় অধিক প্রিয় এবং কল্যাণকর।" (সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪)

নেকি অর্জনের মাস

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করায়, সে তার সমান সওয়াব পায়" (তিরমিজি : ৮০৭)। রামাদ্বানে প্রতিটি ভালো কাজের জন্য কয়েকগুণ বেশি পুরস্কার দেওয়া হয়।

রামাদ্বান মাসে ফরজ আমলের ফজিলত

রামাদ্বানের একটি ফরজ আমল অন্য মাসের ৭০টি ফরজ আমলের সমান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রামাদ্বানের একটি ফরজ ইবাদত অন্য মাসের ৭০টি ফরজের সমান এবং একটি নফল ইবাদত একটি ফরজের সমান" (বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান)। এই ফজিলত থেকে বোঝা যায়, রামাদ্বানের

আমলগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এটি তাকওয়া অর্জন এবং জান্নাতের পথে চলার এক বিশেষ সুযোগ।

রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। এটি শুধুমাত্র রোজাদারদের জন্য। কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, 'রোজাদাররা কোথায়?' তারা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, এবং এটি তাদের জন্যই বন্ধ হবে।" (সহিহ বুখারি : ১৮৯৬; সহিহ মুসলিম : ১১৫২) রোজাদারদের জন্য জান্নাতে এই বিশেষ দরজা রোজার মর্যাদা প্রকাশ করে।

কুরআন তিলাওয়াত

রামাদ্বান কুরআন নাজিলের মাস। কুরআন পাঠ এবং এর উপর আমল রামাদ্বানের মূল শিক্ষা।

যিকির, তাসবিহ ও দুআ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি দুআ থাকে, যা কবুল করা হয়"(তিরমিজি : ৩৫২৪)। রামাদ্বান দুআ কবুলের মাস। আল্লাহর স্মরণে যিকির ও তাসবিহ রামাদ্বানের প্রতিটি মুহূর্তকে বরকতময় করে।

দান-সদকা, যাকাত ও ফিতরা

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি, এবং তিনি রামাদ্বান মাসে আরও বেশি দান করতেন" (সহিহ বুখারি : ৬/৪৫৩)। রামাদ্বান মাস দান ও সদকার মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য করার মাস।

উম্মাহর ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ

রামাদ্বান উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগিয়ে তোলে। একই সাথে রোজা রাখা, ইফতার করা, এবং ঈদের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানরা একত্রিত হয়। বর্তমান যুগে, যখন বিভাজন এবং বিভ্রান্তি বেড়ে চলেছে, রামাদ্বানের শিক্ষা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে এবং একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

রামাদ্বানে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা : রামাদ্বানের পূর্বে, রামাদ্বানে এবং রামাদ্বানের পরে

রামাদ্বান মাস একটি বিশেষ সময় যা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে হলে আমাদের জন্য একটি সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা প্রয়োজন। রামাদ্বানের প্রস্তুতি, রামাদ্বানের সময় এবং রামাদ্বানের পরেও সেই পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এখানে এই তিন পর্যায়ে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হলো :

রামাদ্বানের পূর্বে প্রস্তুতি

রামাদ্বানের আগে আমাদের নিজেদের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। প্রথমত, আমাদের উচিত নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং নতুনভাবে একটি পরিষ্কার ইবাদতের জীবন শুরু করা। এই সময়ে রামাদ্বান সম্পর্কে ইসলামি জ্ঞান বাড়ানো, রোজা রাখার নিয়ম এবং কুরআনের শিক্ষাগুলো নিয়ে অধ্যয়ন করা জরুরি। রামাদ্বানের আগে রোজার নিয়ম অভ্যাসে আনার জন্য আমরা শাবান মাসে কিছু নফল রোজা রাখতে পারি। এর পাশাপাশি আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা এবং ধৈর্যের অনুশীলন করা উচিত, যাতে রামাদ্বানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় সহজে সহ্য করা যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো রামাদ্বানের জন্য একটি সময়সূচি তৈরি করা। এর মধ্যে থাকবে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, কুরআন তিলাওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ, এবং দান-সদকার পরিকল্পনা। এছাড়া, আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করা, যাতে রামাদ্বানের সময় ইবাদতে পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়।

রামাদ্বানের সময়

রামাদ্বানের সময় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আত্মশুদ্ধি সাধন। প্রতিদিন নিয়মিত সেহরি করা এবং ইফতারের সময় দোয়া পড়া আমাদের একটি অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। এই সময়ে ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করা রামাদ্বানের একটি প্রধান কাজ। পাশাপাশি তারাবি নামাজ পড়া, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা এবং বেশি বেশি দোয়া ও যিকির করার জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করা জরুরি। রামাদ্বানের সময় রোজা রাখার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থেকে বিরত থাকা নয়, বরং নিজের আচরণে পরিবর্তন আনা। আমাদের জিহ্বা, চোখ এবং কানকে পাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। কারো সাথে রাগ বা ঝগড়া না করা এবং অন্যদের সাথে দয়া ও সহানুভূতির আচরণ করা রামাদ্বানের মূল শিক্ষা। রামাদ্বানেদান-সদকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সাহায্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাকাত এবং ফিতরা প্রদান করা আমাদের উপর ফরজ, যা রামাদ্বানে করা আরও উত্তম। এছাড়া, প্রতিদিন অন্তত একটি রোজাদারকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা উচিত।

ামাদ্বানের পরে

রামাদ্বান শেষ হওয়ার পরও আমাদের অর্জিত গুণাবলি এবং অভ্যাসগুলো ধরে রাখা জরুরি। রামাদ্বান আমাদের যেভাবে আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া শিখিয়েছে, সেই শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। রামাদ্বানের পরে আমাদের উচিত নফল রোজার মাধ্যমে এই অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া। শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা রাখা আমাদের জন্য সুন্নত এবং এটি এক বছর রোজা রাখার সমান সওয়াব দেয়। এর পাশাপাশি, আমাদের উচিত নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দান-সদকা চালিয়ে যাওয়া। রামাদ্বানের সময় আমরা যেভাবে পাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি, রামাদ্বানের পরেও সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের জীবনে আল্লাহর আনুগত্য এবং সৎকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুপরিকল্পিত জীবনযাত্রা অবলম্বন করতে হবে। রামাদ্বানের পরে আমরা ঈদুল ফিতরের আনন্দ উদযাপন করি। তবে এই আনন্দের মধ্যেও আমাদের উচিত দরিদ্র এবং অসহায় মানুষদের সহায়তা করা, যাতে তারাও ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারে।

উপসংহার

রামাদ্বান মাস একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের সময়। এই সময়ে অর্জিত শিক্ষা আমাদের পুরো বছরের জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেয়। রামাদ্বানের আগে নিজেকে প্রস্তুত করা, রামাদ্বানের সময় ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি করা এবং রামাদ্বানের পরেও সেই অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রামাদ্বানের শিক্ষা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

রামাদ্বানের শিক্ষা অতীতের মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি, নৈতিকতার উত্থান, এবং সামাজিক সংহতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামাদ্বান আমাদের শিখায় কীভাবে আল্লাহর আনুগত্যে জীবন পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে তোলা যায়। আল্লাহ আমাদের রামাদ্বানের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন। আমিন।

রামাদ্বান শুধু একটি ধর্মীয় মাস নয়; এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। এটি আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করে, আত্মশুদ্ধি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং একটি নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে। রামাদ্বানের শিক্ষাগুলো যদি আমরা সারা বছর পালন করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর এবং পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন। আমিন।

রামাদ্বান মাস আমাদের জীবনের জন্য একটি অনন্য প্রশিক্ষণের সময়। এটি আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং নিজেদের আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে। রামাদ্বান আমাদের জীবনের জন্য এক স্বর্ণালী সময়, যা আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি এবং আখিরাতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। আল্লাহ আমাদের এই মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : রিসার্চ, পাবলিকেশন ও এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি, এমসিএ।

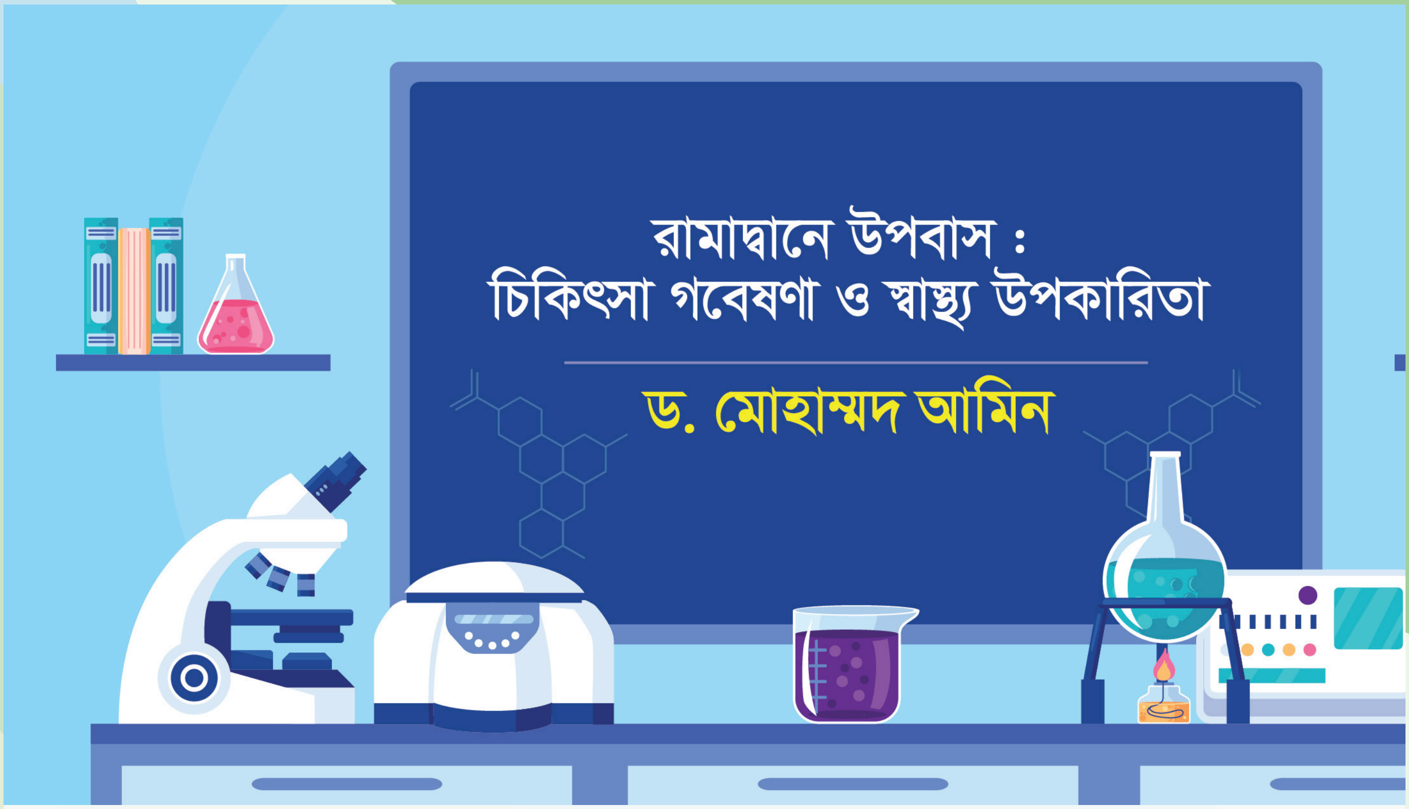

রামাদ্বানে উপবাস : চিকিৎসা গবেষণা ও স্বাস্থ্য উপকারিতা

ড. মোহাম্মদ আমিন

১. ভূমিকা

মানবজাতির সৃষ্টির সূচনা থেকেই উপবাসের অনুশীলন চলে আসছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপবাস বা রোজা নবী মুহাম্মদ (স.)-এর আগের জাতিসমূহের জন্যও ফরজ করা হয়েছিল। "আহলে কিতাব সম্প্রদায়গুলোর বাইরেও বিভিন্ন ধর্মে উপবাস রাখার চর্চা রয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে, সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার একটি কৌশল হিসেবেও রোজা বা উপবাস বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই দৈনন্দিন জীবন যাপনে মাঝে মাঝে উপবাস অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এছাড়াও, উপবাস বা অনশনচ রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তবে, রামাদ্বানের সময় উপবাসের মানবদেহের ওপর প্রভাব নিয়ে পদ্ধতিগত চিকিৎসা গবেষণা অপেক্ষাকৃত নতুন। প্রতি বছর কোটি কোটি মুসলমান রোজা রাখছে এবং এ চর্চা তারা হাজার বছর ধরেই করে আসছে। যদিও অটোফ্যাজি সংক্রান্ত ধারণাটি প্রথম ১৯৬০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইয়োশিনোরি ওসুমি ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগ এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে উপবাস পদ্ধতিটি প্রদাহ এবং ডিমেনশিয়া বা পার্কিনসনের মতো রোগ প্রতিরোধে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যখন ওসুমি অটোফ্যাজি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন এ বিষয়ে বছরে ২০টিরও কম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হত। আর বর্তমানে বিষয়টি ক্যান্সার গবেষণা এবং দীর্ঘায়ু অধ্যয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়ায় প্রতি বছর ৫,০০০-এরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

২. রামাদ্বানের সময় উপবাস নিয়ে চিকিৎসা গবেষণার সূচনা :

মানবদেহে উপবাসের প্রভাব নিয়ে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে চিকিৎসা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে, প্রফেসর ড. গোলাম মুআজ্জাম, এফআরসি প্যাথ, সম্ভবত এই ক্ষেত্রের প্রথম দিকের অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। অনেক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের মতো, তাঁর গবেষণার সূচনার নেপথ্যেও একটি চমকপ্রদ গল্প রয়েছে।

১৯৫৬ সালে, ড. মুআজ্জাম লন্ডন ন্যাশনাল হাসপাতালে তাঁর এফআরসি প্যাথ কোর্স করছিলেন। সে বছর রামাদ্বান পড়েছিল গ্রীষ্মকালে, এবং তিনি প্রতিদিনের মতো সেদিনও রোজা পালন করছিলেন। তাঁর সহকর্মী ড. জে.এন. কামিংস জানতে পেরে অবাক হন যে, ড. মুআজ্জাম পুরো রামাদ্বান মাসে প্রায় ১৯ ঘণ্টা করে প্রতিদিন খাবার এবং পানি ছাড়াই রোজা রাখছেন। ড. কামিংস এ তথ্যটি জেনে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন যে, এত দীর্ঘ সময় উপবাস থাকলে লিভারের ক্ষতি করতে পারে।

ড. মুআজ্জাম উত্তরে বলেন, "মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোজা রাখছে, এবং এখনও পর্যন্ত এমন একটি প্রমাণও পাওয়া যায়নি, কোনো একজন মুসলমানের লিভার এই উপবাসের কারণে অসুস্থ হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

এমনটা শুনে ড. কামিংস বলেন, "এত দীর্ঘ সময় রোজা রাখলে তো লিভারের ক্ষতি হওয়ার কথা। তাছাড়া, বিষয়টি নিয়ে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো গবেষণাও করা হয়নি।"
ড. মুআজ্জাম বলেন, "আমার জানামতে এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। তবে, রোজার কারণে নেতিবাচক কিছু হয়েছে এমন কোনো তথ্যও নেই। তবে আমি নিজেও মনে করি, এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।"

৩. রামাদ্বানে উপবাস প্রসঙ্গে প্রফেসর গোলাম মুআজ্জামের গবেষণা
প্রফেসর মুআজ্জাম পরবর্তীতে যখন দেশে ফিরে আসেন এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজে কাজ শুরু করেন তখন রামাজানের উপবাস নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। আর এক্ষেত্রে লন্ডনের উপরিউক্ত কথোপকথোনটিই তাকে এই গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। গবেষণার অংশ হিসেবে তিনি রামাদ্বানের রোজা পালনকারী ব্যক্তিদের ওপর উপবাসের প্রভাব নিয়ে একটি নিরীক্ষা শুরু করেন। অসাধারণ এই গবেষণার ফলাফল ১৯৫৯ সালে লন্ডনের জার্নাল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন-এ প্রকাশিত হয়।

গবেষণায় দুটো ভিন্ন গ্রুপকে শামিল করা হয়। এর মধ্যে একটি গ্রুপ ছিল রোজাদার মুসলমানদের দল এবং অন্যটি গ্রুপটিতে যারা ছিলেন তারা সবাই ছিল অমুসলিম। এই নিরীক্ষায় নিম্নোক্ত মাপকাঠিগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়, শরীরের ওজন, তাপমাত্রা, হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, বেসাল মেটাবলিক রেট (বিএমআর), এবং পানি ভারসাম্য।
পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল :

- শরীরের ওজন : প্রায় অপরিবর্তিত।
- বেসাল মেটাবলিক রেট (বিএমআর) : স্বাভাবিক সীমার মধ্যে ছিল।
- হৃদস্পন্দন, (হার্টবিট), তাপমাত্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং রক্তচাপ : দু একটি ক্ষেত্রে সামান্য হ্রাস।
- পেটের অম্লতা : অম্লতা যতটা না বেড়েছে সে তুলনায় বেশি কমেছে।
- রক্তে গ্লুকোজ : সামান্য হাইপোগ্লাইসেমিক হলেও তা বিপজ্জনক পর্যায়ে ছিল না; গ্লুকোজ টেস্টে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।
- পটাশিয়াম, ইউরিয়া, কোলেস্টেরল, ক্ষার, ক্লোরাইড : কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।
- ইএসআর, প্যাকড সেল ভলিউম (পিসিবি), এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা : আহামরি কোনো পার্থক্যও ছিল না।
- লিভার ফাংশন টেস্ট : অ্যালকালাইন ফসফাটেজ, থাইমল টার্বিডিটি, এবং জিঙ্ক সালফেট টার্বিডিটির পরীক্ষায় কোনো অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি।
- হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা : পটাসিয়ামের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস হয়নি; ইসিজি রিপোর্ট স্বাভাবিক ছিল।
- কিডনি কার্যক্ষমতা : ২৪ ঘণ্টার পানি ও লিকুইডের ইনপুট/ আউটপুট অপরিবর্তিত ছিল।
- প্রস্রাব পরীক্ষা : উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল না।
- ইওসিনোফিল : মাত্রা স্বাভাবিক ছিল।
- গর্ভবতী নারী : স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, রামাদ্বানের রোজা রোজাদারদের মধ্যে স্বাস্থ্যগতভাবে কোনো উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে না। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসমূহ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার ভিত গড়ে দেয়।

৪. প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রতিবেদন
১৯৯৪ সালে মরক্কোর কাসাব্লাংকায় "স্বাস্থ্য ও রামাদ্বান" বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপবাসের চিকিৎসাগত নীতিশাস্ত্র নিয়ে ৫০টি বিস্তৃত গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। এই গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন চিকিৎসাগত অবস্থার উন্নতির দিকটি তুলে ধরে এবং উল্লেখ করে যে রোজা রাখার ফলে স্বাস্থ্য বা প্রাথমিক চিকিৎসায় অবস্থার তেমন কোনো অবনতি হয় না। তবে, গুরুতর অসুস্থ রোগী যেমন টাইপ ১ ডায়াবেটিস, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, কিডনি স্টোনসহ অনুরূপ সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোজা রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণে তাদের রোজা না রাখাই শ্রেয়।

৫. স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য উপবাস এবং মুসলমানদের অনুশীলন
ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং স্বাস্থ্যগত অনুশীলনের জন্য অনিয়মিত স্বল্প-মেয়াদী উপবাস অনেক সংস্কৃতি ও ধর্মের চর্চাতেই দৃশ্যমান এবং এটি হাজার বছর ধরে প্রচলিত। তবে, ক্যালোরি কমিয়ে রাখার নিয়ামক হিসেবে উপবাসের প্রভাবের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে নতুন। ইকারিয়ার ব্লু জোন (মূলত গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল) অঞ্চলে দীর্ঘায়ু

মুসলমানরা পুরো রমজান মাস জুড়ে বাধ্যতামূলক উপবাস পালন করেন। এর বাইরেও, নবী মুহাম্মদ (সা.) নির্দিষ্ট কিছু দিনে ঐচ্ছিক রোজা রাখতে উৎসাহিত করেছেন, যেমন সোমবার, বৃহস্পতিবার, চন্দ্র মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ, এবং শাওয়াল, মুহাররম ও শাবান মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে। এই সব মিলিয়ে মুসলমানরা প্রতি বছর ১৫০ দিনেরও বেশি রোজা পালন করে থাকেন।

মানুষরা প্রতি বছর প্রায় ১৫০ দিন ধর্মীয় উপবাস পালন করেন।

মুসলমানরা পুরো রামাদ্বান মাস জুড়ে বাধ্যতামূলক উপবাস পালন করেন। এর বাইরেও, নবী মুহাম্মদ (সা.) নির্দিষ্ট কিছু দিনে ঐচ্ছিক রোজা রাখতে উৎসাহিত করেছেন, যেমন সোমবার, বৃহস্পতিবার, চন্দ্র মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ, এবং শাওয়াল, মুহাররম ও শাবান মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে। এই সব মিলিয়ে মুসলমানরা প্রতি বছর ১৫০ দিনেরও বেশি রোজা পালন করে থাকেন।

৬. নোবেল বিজয়ী ড. ইয়োশিনোরি ওসুমির গবেষণা

জাপানি কোষ জীববিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইয়োশিনোরি ওসুমি কোষের অটোফ্যাজি প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর অসামান্য গবেষণার জন্য ২০১৬ সালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অটোফ্যাজি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষ তাদের উপাদান পুনঃব্যবহার ও নবায়ন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপবাস অটোফ্যাজিকে সক্রিয় করে, যা বার্ধক্যের প্রক্রিয়া ধীর করে এবং কোষের নবায়নকে ত্বরান্বিত করে।

ড. ওসুমি দেখিয়েছেন যে কোষ অটোফ্যাজির মাধ্যমে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোগুলো অপসারণ করে। কোষের স্বাস্থ্য, পুনঃনবায়ন এবং বেঁচে থাকার জন্য এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অটোফ্যাজি ক্যান্সার কোষ দমন, বার্ধক্য প্রতিরোধ, রোগজীবাণু নির্মূল, এবং কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিষ্কার করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. মানবদেহে রোজার উপকারিতা : গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল :

ক. ডিটক্সিফাইং প্রভাব

রোজা ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করার উপায় হিসেবে কাজ করে।

খ. ক্ষুধা দমন

রোজা রাখার পর পাকস্থলী সংকুচিত হয়, যার ফলে খাবারের পরিমাণ কমে এবং দ্রুত তৃপ্তি আসে।

গ. মেটাবোলিজম বৃদ্ধি করে

রোজা স্থূলতা হ্রাস করে, কারণ এটি যকৃতের এনজাইমগুলোকে কোলেস্টেরল ও চর্বি ভেঙে পিত্ত অ্যাসিড এবং তাপে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে– যা সার্বিকভাবে বিপাক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

ঘ. ওজন হ্রাস

রোজার সময় দেহ সঞ্চিত চর্বিকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। রেজিস্ট্যান্স প্রশিক্ষণের সাথে মাঝে মাঝে যদি উপবাসও থাকা যায় তাহলে চর্বি অনেকটা কমে আসে এবং শারীরিক গঠনও সুন্দর হয়।

ঙ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

রোজার সময় শরীর হজম প্রক্রিয়া থেকে কিছুটা সরে এসে বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বিপাক প্রক্রিয়ায় তৎপর হয়– যা নিরাময় সক্ষমতা বাড়ায় এবং পেশি সংহত হয়।

চ. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

লবণের পরিমাণ কমানো এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে এর নির্গমনের ফলে রক্তচাপ হ্রাস পায়।

ছ. ক্রীড়া প্রশিক্ষণ

চর্বি পোড়ানো এবং বড়ো ইভেন্টগুলোর আগে পেশি সংহত করার জন্য এ্যাথলেটরা উপবাস কৌশলের প্রয়োগ করেন।

জ. কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের উন্নতি

রোজা কোলেস্টেরল কমায়, রক্তনালী সম্প্রসারিত করে এবং পেশির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা হৃদযন্ত্রকে আরও উন্নত করে।

ঝ. মানসিক স্বাস্থ্যের উপকারিতা

ক্যালোরি, চিনি এবং লবণের গ্রহণ কমে যাওয়ায় রোজা মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, মানসিক চাপ কমাতে এবং মনোযোগ বাড়াতে সহায়ক হয়। যা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটায়।

ঞ. রক্তে গ্লুকোজ স্থিতিশীলতা

রোজা গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

ট. উজ্জ্বল ত্বক এবং বার্ধক্য প্রতিরোধ

রোজা কোলাজেন উৎপাদনকে উৎসাহিত করে এবং অপ্রয়োজনীয় কোষ ভেঙে দেয়। এর ফলে টিস্যুগুলো পুনঃসংস্কার হয়, বার্ধ্যক্যের গতি হ্রাস পায় এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়।

ঠ. মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার উন্নতি

রোজা রক্তে এন্ডোরফিনের মাত্রা বাড়ায়, যা শারীরিক ব্যায়ামের মতোই সুস্থতার অনুভূতি এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে।

ড. শান্তি ও স্থিতির উৎস

রোজা ব্যক্তিগত শত্রুতা কমায়, অপরাধের হার হ্রাস করে এবং সম্প্রীতির অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ঢ. মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

কুরআন তিলাওয়াত এবং নিয়মিত ও অতিরিক্ত নামাজ ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

৮. উপসংহার

ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালন স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খুবই নিরাপদ। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নানা গবেষণা করা হলেও এখনো পর্যন্ত রোজার কোনো নেতিবাচক প্রভাব আবিষ্কৃত হয়নি। বরং রোজা রাখার মাধ্যমে বিপাক কার্যক্রমের উন্নতি, হৃদযন্ত্র এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, রক্তে গ্লুকোজের স্তরের স্থিতিশীলতা, এবং কোষ পুনঃনবায়ন ও ডিটক্সিফিকেশনকে সমর্থন করার মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাওয়া গেছে। এই গবেষণাগুলো দায়িত্বশীলভাবে রোজা পালনের ক্ষেত্রে এর নিরাপত্তা এবং সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত সুবিধাও নিশ্চিত করে।

৯. রেফারেন্সসমূহ

ক. পবিত্র কুরআন ২ : ১৮৩

খ. রামাদ্বানের রোজার মানবদেহের ওপর প্রভাব, প্রফেসর মুআজ্জাম, The journal of ‘Tropical Medicine and Hygiene’, লন্ডন, ১৯৫৯

গ. প্রফেসর ওসুমি, Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction; Journal of Cell Biology, ১৯৯২। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।

ঘ. মুসলিম এইড রিসার্চ টিম, লন্ডন।

ঙ. www.bluezone.com

(ডিসক্লেইমার : এই নিবন্ধটি চিকিৎসাগত গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। রামাদ্বান মাসে রোজা রাখার আধ্যাত্মিক দিকটি এখানে আলোচনা করা হয়নি।)

লেখক : চিকিৎসক, যুক্তরাজ্য।

মুসলিম জীবনে সওমের সফলতা

ফিরোজ মাহবুব কামাল

কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তাকওয়া?

রোজার লক্ষ্য কী শুধু এটুকু, রোজাদার ব্যক্তিটি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পানাহার বন্ধ রাখবে? মাসভর তারাবিহ পড়বে এবং কুরআন তেলাওয়াত করবে? এবং রামাদ্বান শেষে মহা ধুমধামে ঈদ উদযাপন করবে? কত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করা হলো– সেটিই কি পথচলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছা হলো কিনা। রোজার মূল লক্ষ্য, তাকওয়া অর্জন। মহান আল্লাহ তায়ালা সে লক্ষ্যটি ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সুরা বাকারা : ১৮৩)।

উপরিউক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, তাকওয়া অর্জনই রোজার মূল কথা। এক মাসের রোজায় রোজাদারের জীবনে কতটা তাকওয়া সৃষ্টি হলো সেটিই রোজার সফলতা মাপকাঠি। আগুনের উত্তাপ গোপন থাকার বিষয় নয়। তেমনি গোপন থাকে না তাকওয়ার উত্তাপও। সেটি প্রকাশ পায় ব্যক্তির চরিত্র, কর্ম ও আচরণে; এবং বিপ্লব আনে রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। তাকওয়ার গুণেই মানুষ মহামানবে পরিণত হয়। এমন মহা মানবদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে দেশ তখন নেককর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, মানবতা ও উচ্চতর সংস্কৃতিতে এক মহান সভ্যতা গড়ে তোলে। যেমনটি হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। অপর দিকে যে মুসলিমেরা দুর্বৃত্তিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে এবং শরিয়তের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবজ্ঞা যাদের রাজনীতি– তখন কী বুঝতে বাকি থাকে এমন মুসলিমের দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা ও রোজাদারের সংখ্যা বিপুল ভাবে বাড়লেও জনজীবনে তাকওয়া বাড়েনি? তখন কী গোপন থাকে, এমন মুসলমানদের জীবনে রোজা তেমন সফলতা আনেনি?

ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আমল ও আচরণের বিপ্লবটি কখনোই খাদ্যপানীয় বা দৈহিক গুণে আসে না। সেটি আসে তাকওয়ার গুণে। ইসলাম কবুলের সাথে সাথে ব্যক্তি মুসলমান হয় বটে, তবে তাতে সে চারিত্রিক বিপ্লবটি আসে না। কারণ ঈমান আনার সাথে সাথেই তাকওয়া সৃষ্টি হয় না। তাকওয়ার জন্য তাকে আরও সামনে এগুতে হয়। সে জন্য চাই আধ্যাত্মিক পুষ্টি ও উন্নয়ন, সে জন্য চাই কুরআনের জ্ঞান বা ইলম। ইসলামের শুরু তাই নামাজ-রোজা দিয়ে হয়নি। হয়েছে ওহির জ্ঞান দিয়ে। আর সে ওহির জ্ঞান নিয়ে কুরআন নাজিল হয়েছিল পবিত্র রামাদ্বান মাসে। আর কুরআন চর্চা, ইবাদত ও প্রশিক্ষণের মহা আয়োজন নিয়েই রমযানের মাসের মাসব্যাপী

রোজা। কুরআনই হলো মানব জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তেল-গ্যাস, সোনারূপা, হিরা-জহরত বা অন্য কোন সম্পদ নয়। কুরআন থেকেই মানুষ সরাসরি ওহির জ্ঞান পায়। সে জ্ঞান যেমন চিন্তার রাজ্যে মহাবিপ্লব আনে, তেমনি আলোকিত করে ব্যক্তির সমগ্র সত্ত্বাকে। সে আলোকিত মনে জন্ম নেয় তাকওয়াও।

তাকওয়া অর্জন কীরূপে সম্ভব?

মহান আল্লাহ তায়ালা শুধু তাঁর প্রিয় নবীর সাথেই কথা বলেননি, বরং তাঁর প্রতিটি প্রিয় বান্দাহর সাথেও কথা বলেন। সেটি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। তাই কুরআন পাঠ কোন মামুলি বিষয় নয়। প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ হলো, যখন সে এ কুরআন পাঠ করে তখন তার ঈমান আরও বেড়ে যায়। আর যখন মহান আল্লাহর নাম শুনে তখন তার আত্মা ভয়ে কেঁপে উঠে। সে সত্যটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“নিশ্চয়ই ঈমানদার তো তারাই যাদের অবস্থা এমন যে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে। এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনানো হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর তারা ভরসা পোষণ করে।” (সুরা আনফাল : ২)

কুরআন তাই মানুষের চিন্তার ভূমিতে ভূমিকম্পের কম্পন তোলে, এবং গুড়িয়ে দেয় তার পূর্বের ধারণকৃত ধ্যান-ধারণাগুলো। এবং নির্মাণ করে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির ইমারত। এভাবেই গড়ে উঠে ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। কুরআনের মাধ্যমেই তিনি পথ দেখান এবং তার সাথে অতি একান্ত সংযোগটি গড়ে তোলেন। সে সংযোগের মাধ্যমে আত্মার গভীরে তিনি এ বাণীটি তিনি স্পষ্ট করে পৌঁছে দেন যে, বান্দাহ থেকে তিনি আসলে কি চান। জানিয়ে দেন, এ জীবনের সঠিক পথ কোনটি এবং কোন আমলটি তাঁর কাছে অধিক মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য। ফলে যার মধ্যে কুরআনের জ্ঞান নাই, তার জীবনে হেদায়েত ও সত্যপথ প্রাপ্তিও নাই। তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতাও নাই। এ কুরআনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ শুধু ঈমানের অপূর্ণতা নয়, তাকওয়ার অপূর্ণতাও। মাহে রামাদ্বান, আল কুরআন, তাকওয়া, মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফেরাত এবং পরকালে নাজাত-এ গুলিকে আলাদা ভাবে দেখার সুযোগ নাই। একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাহে রামাদ্বানের ফজিলত অন্য যে কোন মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এ কুরআনের জন্যই। লাইলাতুল ক্বদরের রাতে কুরআন নাজিলের কারণে হাজার মাসের চেয়েও এ রাতটি শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের নাম তাক্বওয়া

মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ থাকতে পীরের খানকায় বা কবরে গিয়ে আধ্যাত্মিকতা খোঁজা ইসলামের শিক্ষা নয়। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে তাই কোন পীরের খানকাহ বা কবর ছিল না। সে জন্য তারা মহান আল্লাহর নসিহতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কুরআনের দিকে ধাবিত হয়েছেন। কুরআনের ভাষা জানা না থাকলে সেটি শেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আর সে নসিহত তো এসেছে খোদ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

অর্থ : যারা আল্লাহর সাথে বন্ধন গড়লো তারাই সিরাতুল মোস্তাকিমের পথে নির্দেশনা পেল। আর মহান আল্লাহর সাথে বন্ধন গড়ার মাধ্যম তো আল্লাহর সৃষ্ট চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত যেমন নয় তেমনি দেবদেবীও নয়। বরং খোদ আল্লাহর কালাম আল কুরআন। পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা সংজ্ঞায়িত করেছেন, মো'য়েজাতুল হাসানা অর্থাৎ উত্তম ওয়াজ বা নসিহত রূপে। মহান আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নসিহত দাতা আর কে হতে পারে? মহান করুণাময় আল্লাহ তার মু'মিন বান্দাহর কাছে তাঁর প্রতি কর্মে নির্দেশনাময় সে নসিহতটি পৌঁছে দিয়ে থাকেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই। এজন্যই কুরআনের জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ। কারণ এ জীবনে যত জ্ঞান লাভই হোক, কুরআনের পাঠটি বাঁকি থাকলে হেদায়াত লাভ, সিরাতুল মোস্তাকিম লাভ, তাকওয়া লাভ ও পরকালে চূড়ান্ত সফলতা লাভ– এসবই নাগালের বাইরে থেকে যাবে। নামাজ-রোজা আদায় করা ছাড়া যেমন মুসলমান হওয়া যায় না তেমনি কুরআনি জ্ঞানার্জনের ফরজ আদায় ছাড়াও তাকওয়া অর্জন সম্ভব হয় না। বস্তুত মুসলমান হওয়ার অর্থই যে আলেম হওয়া– সেটিই তো পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষা। অজ্ঞতার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ সে কথাও ওহির মাধ্যমে বার বার ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অর্থ : সমগ্র সৃষ্টিকুলের মাঝে একমাত্র আলেমগণ আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য আলেম হওয়া যে কতটা জরুরি সেটিই তো এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে।

কীভাবে কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানবান হব :

তবে আলেম হওয়ার অর্থ মাদ্রাসার সার্টিফিকেটধারি হওয়া নয়, বরং কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া। নবীজী (সা.)'র আমলে সার্টিফিকেট বিতরণ হয়নি, বরং মসজিদের জায়নামাজে বসে জ্ঞান বিতরণ হয়েছে। তাই নবীজী (সা.)'র জামানায় এমন কোন সাহাবা পাওয়া যাবে কি যার মধ্যে কুরআনের জ্ঞান ছিল না? সে আমলে সাহাবিই হওয়ার অর্থই ছিল কুরআনি জ্ঞানের আলেম হওয়া। কে জ্ঞানী আর কে জাহেল সেটির পরিমাপে মূল মাপকাঠি হলো এ কুরআনি জ্ঞান। ওহির জ্ঞান ছাড়া পিরামিড বা কম্পিউটার নির্মাণ, রেলগাড়ি বা উড়োজাহাজ নির্মাণ বা পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার– সবই সম্ভব। এরূপ আবিষ্কারে বহু কাফের ব্যক্তিও যুগে যুগে বিপুল সক্ষমতা দেখিয়েছে। সেসব বিস্ময়কর আবিষ্কারের সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ সমকালীন যুগে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও শিক্ষিত রূপে গণ্য হয়েছে। অথচ মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো সত্যের আবিষ্কার এবং সবচেয়ে বড়ো প্রজ্ঞা হলো মিথ্যা থেকে বাঁচার প্রজ্ঞা। কিন্তু তাদের ক'জন সত্য পথ পেয়েছে এবং ক'জন বেঁচেছে মিথ্যার অনুসরণ থেকে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কে জাহেল আর কে জ্ঞানী সে মাপকাঠিটি ভিন্ন। সে মাপকাঠিতে কাফেরগণ যতবড়ো আবিষ্কারকই হোক তারা জাহেল বা অজ্ঞ। আবিষ্কারের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাতে পারিনি; জাহান্নামের আগুন থেকেও তাদের মুক্তি দিতে পারিনি। অথচ মানব জীবনে সেটিই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সমগ্র বাঁচাটিই তাই ব্যর্থ হয়েছে। সে ব্যর্থতা তাদের জাহান্নামের আগুনে নিয়ে পৌঁছাবে- সে ঘোষণাটি তো খোদ মহান আল্লাহ তায়ালার।

কুরআনই সিরাতুল মোস্তাকিম

রোজ-হাশরের বিচার দিনে কে কতবড়ো বিজ্ঞানী ছিল বা কতগুলি আবিষ্কার করেছে সে প্রশ্ন তোলা হবে না। বরং প্রশ্ন তোলা হবে কে কতটা সিরাতুল মোস্তাকীম বেয়ে পথ চলতে পেরেছে সেটি। আর সে পথ দেখায় তো কুরআনের জ্ঞান। "ইহদিনাস সিরাতুল মোস্তাকিম"এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আরেকটি নেই। সিরাতুল মোস্তাকিম পাওয়ার চেয়ে মানব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজই নাই। আল্লাহ তায়ালা তাই প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে এ দোয়া পাঠ বাধ্যতামূলক করেছেন। প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তিকে প্রতিমুহূর্তে বাঁচতে হয় সিরাতুল মোস্তাকিমে চলার সে চেতনাটি নিয়ে। সে চেতনাটিই মু'মিন ব্যক্তির তাকওয়া। তাই মুসলমান যেখানেই ঘর বাঁধে সেখানে শুধু ঘরবাড়ি, চাষাবাদ, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্যই বাড়ায় না, কুরআন চর্চার মহা-আয়োজনও করে। মানুষ কতটা মহামানব হবে সেটি বুঝা যায় সমাজে কুরআন চর্চার সে আয়োজন দেখে। রামাদ্বানের মাসে সে আয়োজনটিই তো বেশি বেশি হয়। এ মাসেই তারাবিহর নামাজে হাফেজদের মুখ থেকে পুরা কুরআন শুনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুরআন বুঝার সামর্থ না বাড়িয়ে শুধু তেলাওয়াত শুনে কি সেটি সম্ভব? জ্ঞান তো মগজে তখনই বিপ্লব আনে যখন জ্ঞানের সে কথা গুলো মগজে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। সেটি কি না বুঝে তেলাওয়াত করা বা শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই মিশর, ইরাক, সিরিয়া, সুদান, আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মৌরতানিয়াসহ বিশাল এলাকার মানুষ নিজ নিজ মাতৃভাষা দাফন করে কুরআনের ভাষা শিখেছে এবং নিজ দেশ সে ভাষার প্রতিষ্ঠাও দিয়েছে।

ব্যর্থতা যেখানে কুরআন না বুঝার

আজকের মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাটি কুরআন না বুঝার। এসেছিল বুঝার জন্য, মানুষ বানিয়েছে পড়ার কেতাব। মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে, মসজিদ-মাদ্রাসাও বাড়ছে, বাড়ছে ঘরে ঘরে কুরআন পাঠও। কিন্তু বাড়ছে না কুরআনের জ্ঞান। ফলে বাড়ছে না মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সংযোগ। ফলে আসছে না চেতনা রাজ্যে ও চরিত্রে বিপ্লব। ফলে বার বার মাহে রামাদ্বান এলেও মুসলিম সমাজে গড়ে উঠছে না তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ। কুরআন না বুঝার কারণে আল্লাহ তায়ালা যে কি চান– সেটিই তাদের কাছে অজানা থেকে যাচ্ছে। ফলে কোটি কোটি মানুষ রোজা রাখলেও তাদের জীবন চলছে জাহিলিয়াতের পথ বেয়ে। একারণেই মুসলিম দেশেগুলিতে সৃষ্টি হচ্ছে না উন্নত মুসলমান ও নির্মিত হচ্ছে না উচ্চতর সমাজ ও সভ্যতা। বরং যা বাড়ছে তা হলো আল্লাহর দ্বীন থেকে সীমাহীন ভ্রষ্টতা ও পাপাচার। বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে তাই রোজাদারের সংখ্যা বিপুল ভাবে বাড়লেও দুর্নীতিতে বিশ্বরেকর্ডও নির্মিত হচ্ছে। অথচ তাদের জীবনে তাকওয়া সৃষ্টি হলে কি এরূপ হতো? তাকওয়া যেমন আল্লাহভীরু মানুষের জন্ম দেয় তেমনি উচ্চতর সভ্যতারও জন্ম দেয়। অথচ বাংলাদেশে সেরূপ সভ্যতা নির্মিত হয়নি। ইসলামের বিজয় আসার আগে আরব ভূমিতে মহান আল্লাহ ও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে যেরূপ বিদ্রোহ হত সেরূপ বিদ্রোহ আজ এ দেশটিতেও। আল্লাহর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতাগুলো ধরে পড়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত, প্রশাসন ও সংস্কৃতিতে। বরং সমগ্র দেশ ও তার রাজনীতি, শিক্ষাসংস্কৃতি, অর্থনীতি ও আইন-আদালতের প্রতিটি অঙ্গন অধিকৃত আল্লাহর বিরুদ্ধে

বিদ্রোহীদের হাতে। তাই বাংলাদেশের মত শতকরা ৯২ ভাগ মুসলিমের দেশে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও তাঁর শরিয়তি বিধানের পরাজয়ে কোন কাফের বাহিনীর প্রয়োজন পড়ছে না, সেটি ঘটছে মুসলমানদের হাতেই। অথচ প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যখন দেশে দেশে আল্লাহর শরিয়তি বিধানের বিজয় এনেছেন তখন সেসব দেশে শতকরা ৯২ ভাগ মুসলিমের বাস ছিল না। নিদারুণ এ ব্যর্থতা যে জাহান্নামের পথ– তা নিয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? তাকওয়ার বিপ্লব আনতে মুসলমানের রোজা-পালন যে কতটা ব্যর্থ হচ্ছে সেটি কি এরপরও বুঝতে বাঁকি থাকে? রোজা পরিণত হয়েছে বিপ্লবহীন এক উপবাসে।

মুসলিম সমাজে তাক্বওয়া বুঝার দৈন্যতা

প্রশ্ন হলো, আজকের মুসলিম সমাজে তাকওয়ার ধারণাই বা কীরূপ? তাকওয়া অর্থ ভয়। তবে সে ভয় এমন নয় যে, হঠাৎ বাঘের সামনে পড়া ভীতিগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় তা বাকশূন্য করবে। এ ভয় ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা সুনামীর ভয় নয়। কলেরা বা কান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও নয়। তাকওয়া হল আল্লাহ-সচেতনতার এমন এক মানসিক অবস্থা যা প্রতি পদে পাপ থেকে ফেরায় এবং সদাসর্বদা প্রেরণা জোগায় নেক-আমলে। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহর অবাধ্য তথা সিরাতুল মোস্তাকিম থেকে বিচ্যুৎ হওয়ার ভয়। তথা নাফরমানির ভয়। ভয় এখানে রোজহাশরের বিচার দিনে অপরাধের বোঝা নিয়ে দাঁড়ানোর। সে ভয় থেকেই বেড়ে উঠে তাকওয়া এবং জন্ম নেয় আল্লাহকে খুশি করার সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা। সৃষ্টি করে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির চেতনা। এমন চেতনায় জীবনের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় আল্লাহর অমূল্য নিয়ামত, গণ্য হয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাপর্ব রূপে। তখন বিরামহীন ব্যস্ততা বাড়ে সে পরীক্ষায় কি করে কৃতকার্য হওয়া যায় তা নিয়ে। কোন ব্যক্তি দূরপাল্লার মোটরওয়েতে যখন দ্রুত গাড়ি চালায় তখনও একটি ভয় তার মনে সব সময়ে কাজ করে। সেটি হলো, সামান্য নিমিষের অসতর্কতা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। মুহূর্তের মধ্য সে দুর্ঘটনা তার নিজের ও অন্যান্য আরোহির জীবনে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। এমন একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য এক মিনিট বা আধা মিনিট মেয়াদি ভুলেরও প্রয়োজন পড়ে না। নিমিষের ভুল, ঘুম বা অসতর্কতাই সে জন্য যথেষ্ট। চালককে তাই প্রতিটি মুহূর্ত চোখ ও মন খোলা রাখতে হয়। মৃত্যুর ভয় তাকে সর্বমুহূর্ত তর্ক রাখে। গাড়ির চালকের জীবনে এটাই হলো তাকওয়া।

সিরাতুল মোস্তাকিমে চলতে পারাই তাক্বওয়া

আর মু'মিনের জীবনে তাকওয়া হলো সিরাতুল মোস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হওয়ার সার্বক্ষণিক ভয়। মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘটনাটি ব্যক্তির জীবনে যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। সে বিচ্যুতি তো জাহান্নামের পথ। তাতে অনিবার্য হয় জাহান্নামের আযাব। রোজার মূল কাজ মু'মিনের জীবনে এমন ভয়কে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এটিই ঈমানদারের তাকওয়া। তাকওয়া এখানে প্রতিমুহূর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তাঁর প্রতি দায়বদ্ধতার স্মরণ। দায়বদ্ধতা এখানে তাঁর নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফার। কোন দাস কি তার মনিবের হুকুমকে ভুলে থাকতে পারে? রোজাদারের স্মৃতিতে মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকে বলেই সে ক্ষুধা, পীপাসা বা যৌন লিপ্সা সয়ে যায়, সে বিদ্রোহী হয় না। একান্ত নির্জন এ নিভৃতে বসেও সে তখন কিছু মুখে দেয় না। তবে তাকওয়া এখানে নিছক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনতাকে দমিয়ে রাখার সামর্থ্য নয়, বরং সর্ব প্রকার জৈবিক, আত্মিক ও আর্থিক কুপ্রবৃত্তি দমনের ঈমানি শক্তি। এমন তাকওয়া থেকেই প্রেরণা আসে আল্লাহপাকের প্রতিটি হুকুম জানার এবং সে সাথে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের। কুরআনের জ্ঞানার্জনকে তাকওয়াসমৃদ্ধ সে ব্যক্তিটি তখন নিজ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রূপে গ্রহণ করে। কারণ সে বুঝে, অজ্ঞতা নিয়ে সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা অসম্ভব। কারণ কোনটি সিরাতুল মোস্তাকিমের পথ আর কোনটি ভ্রষ্টতার পথ সেটি জানতে বা বুঝতে হলেও তো জ্ঞান চাই। নবীজীর সাহাবাদের মাঝে তাই ইসলামের জ্ঞানে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি ছিল না। তাদের শতকরা শতভাগই ছিলেন আলেম। ইসলামে তাই নামাজ-রোজার আগে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে ফরজ করা হয়েছে। সাহাবাদের জীবনে একসময় নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত ছিল না। জিহাদও ছিল না। ইবাদত বলতে বুঝাতো রাত জাগা এবং রাতে দাঁড়িয়ে বার বার কুরআনের সদ্য নাজিলকৃত আয়াতগুলোকে ধীরে ধীরে আবৃত করা এবং আল্লাহর সে হেদায়েতের বাণীগুলোকে মনের গভীরে বসিয়ে দেওয়া। সে সময় তাদের কাছে সমগ্র কুরআন ছিল না। তখন অর্পিত দায়িত্বটি ছিল, কুরআনের সে আয়াতগুলোর পূর্ণ অনুসরণ এবং অন্যদের কাছে সেগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়া। নবুয়তের শুরুতে নাজিলকৃত সুরা মোজাম্মেলে তো তেমনি একটি চিত্র পাওয়া যায়। ইসলামের ১৪ শত বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আলেম তো গড়ে উঠেছে কুরআনকে বুঝা ও কুরআন অনুসরণের সে অদম্য প্রেরণা থেকেই।

ভ্রষ্টতা যেখানে ইবাদতে

ঘোড়ার আগে যেমন গাড়ি জোড়া যায় না তেমনি কুরআনি

জ্ঞানার্জনের আগে ইবাদতও যথার্থ হয় না। নামাজ-রোজার আগে জ্ঞানার্জনকে ফরজ করার কারণ তো এটাই। পবিত্র কুরআনের প্রথম শব্দটি তাই "ইকরা" অর্থ পড়া। অথচ আজকের মুসলিম সমাজে কুরআন শিক্ষার সে দায়ভার চাপানো হয়েছে স্রেফ মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর। জ্ঞানার্জন যে প্রতিটি মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ সেটিও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরাতুল মোস্তাকিম থেকে ভ্রষ্টতার শুরু মূলত এমন এক চেতনাগত ভ্রষ্টতা থেকেই। ফলে প্রচণ্ড ভ্রষ্টতা বেড়েছে ইবাদতে। রোজা রেখে দোকানে বসে যে ব্যক্তিটি দ্রব্যমূল্য বাড়ায় বা পণ্যে ভেজাল মেশায় বা অফিসে বসে ঘুস খায় বা মানুষের সাথে ঝগড়া করে- এমন ব্যক্তি যে তাকওয়াশূন্য এবং রোজা থেকে কোন কিছুই লাভ করেনি তা নিয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? সে তো তার জীবনে পথ চলায় ভ্রষ্টতার পথ বেছে নিয়েছে। এখানে কাজে তাকে ধাবিত করছে তার অজ্ঞতা। এমন অজ্ঞ ব্যক্তির জীবনে রোজা কি নিছক উপবাস ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেয়? অথচ তাকওয়া-সম্পন্ন ব্যক্তির অদম্য অনুপ্রেরণা হলো, প্রতি মুহূর্তে সিরাতুল মোস্তাকিমে চলায়। তার জীবনের মূল লক্ষ্যটি আখিরাতের সফলতা অর্জন। আর সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তার পার্থিব জীবনের সকল পরিকল্পনা ও সাধনা। ফলে এ জীবনের সর্ব মুহূর্তে তাঁর সতর্কতা হলো সর্বপ্রকার হারাম কাজ থেকে দূরে থাকায়। এবং সর্বমুহূর্তের ব্যস্ততাটি হয় বেশি বেশি নেক আমল করায়। তখন তার জীবনে নেমে আসে পবিত্রতা। অথচ যার মনে হারাম থেকে বাঁচার সে সতর্কতা নাই এবং নেক আমলে ব্যস্ততা নাই– বুঝতে হবে তার মনে তাকওয়াও নাই। অনেক গাছই ফল দেয় না। তেমনি অনেকের নামাজ-রোজা এবং হজ-যাকাতও জীবনে কোন পরিবর্তন আনে না। এরা নামাজ রোজা আজীবন করেও বাঁচে পথভ্রষ্টতা ও পাপকর্ম নিয়ে। নামে মুসলমান হলেও কর্মজীবনে এরা ফাসেক, জালেম ও মুনাফিক। এদের কারণেই মুসলিম দেশগুলোতে আল্লাহর শরিয়তি বিধান আজ পরাজিত এবং মুসলিম ভূমি অধিকৃত হয়েছে ইসলামে শত্রুপক্ষের হাতে। অথচ তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি গভীর দায়িত্ববোধ পায় আল্লাহর সৈনিক রূপে ইসলামের বিজয়ে পূর্ণ আত্ম-বিণিয়োগে। নবীজীর (সা.) আমলে সে সামর্থ্য পেয়েছিলেন প্রতিটি সাহাবা। তাদের জীবনে সর্বক্ষণের তাড়াহুড়া ছিল যেমন হারাম থেকে বাঁচার, তেমনি প্রচণ্ড ব্যস্ততা ছিল বেশি বেশি নেক আমলের ও আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার।

ঈমান ও নেক আমল তাক্বওয়ার সোপান

মু'মিনের জীবনে ঈমান বলবান হলে যেটি অনিবার্য রূপে দেখা দেয় সেটি নেক আমলের প্রতি দুর্বার মোহ। ঈমানদার ব্যক্তি তখন প্রস্তুত হয়ে যায় শুধু মালের কুরবানিতে নয়, জানের কুরবানিতেও। অপর দিকে বদ আমল তা যত ক্ষুদ্রই হোক তার মাঝে তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের ভয় পায়। ফলে তার সর্বক্ষণের সাধনা হয় তা থেকে বাঁচার। যে ব্যক্তির মাঝে বদ আমল থেকে বাঁচার ও বেশি বেশি নেক আমলের তাড়াহুড়া নাই, বুঝতে হবে তার মাঝে তাকওয়াও নাই। এবং পরকালের উপর ঈমানও নাই। ঈমানের দাবিতে সে যত সোচ্চারই হোক, তার সে ঈমানদারি নিতান্তই মেকি। নেক আমলের প্রেরণায় সাহাবাগণ এতটাই অস্থির থাকতেন যে, মাঝ রাতে না ঘুমিয়ে আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে গরিবের ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। চাকরকে উঠের পিঠে চড়িয়ে নিজে রশি ধরে টেনেছেন। সে কাজ করেছেন এমন কি বিশাল রাষ্ট্রের প্রধান তথা আমিরুল মু'মিনুনও। তারা নিজেরা অভুক্ত থেকে মেহমানকে খাইয়েছেন। অসংখ্য ফলবান গাছের বিশাল বাগানকে আল্লাহর রাস্তায় তারা বিলিয়ে দিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে আহত ও অতিতৃষ্ণার্ত হয়ে পানি নিজে না পান করে পাশের তৃষ্ণার্ত মুজাহিদকে দিতে বলেছেন। সর্বোপরি তারা ছটফট করতেন অর্থের পাশাপাশি নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে জিহাদে বিলিয়ে দেওয়ায়। এবং তারা সেটি করতেন অনন্ত ও অসীম কালের জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে। এর চেয়ে বড়ো প্রজ্ঞা আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর মু'মিন বান্দাহ থেকে সে প্রজ্ঞাটাই আশা করেন। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, "তোমরা তাড়াহুড়া করো আল্লাহর মাগফেরাত ও জান্নাত লাভে যা প্রশস্ত হলো আসমান ও জমিনের সমান।" মু'মিনের জীবনে সে তাড়াহুড়াটি সৃষ্টি হয় মূলতঃ কুরআনের জ্ঞানে। এরাই হলেন তেমন ব্যক্তি যাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"নিশ্চয়ই মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল আল্লাহ তায়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং তারা যেমন (আল্লাহর শত্রুদের) হত্যা করে তেমনি নিজেরাও নিহত হয়।" (সুরা তাওবাহ : ১১১)

এমন মানুষদের আধিক্যের কারণেই তখন নেক আমলের প্রচণ্ড প্লাবন এসেছিল সমগ্র মুসলিম সমাজ জুড়ে। আসে রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়। তাকওয়ার সে গুণেই ইসলাম সেদিন গড়ে

তুলেছিল যেমন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। আজ সে কুরআনি জ্ঞান যেমন নাই, তেমনি সে চারিত্রিক বিপ্লবও নাই। এরপরও কি বুঝতে বাঁকি থাকে আজকের মুসলমানদের মূল ব্যর্থতাটি কোথায়?

আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ দান ও প্রত্যাশা

মাহে রামাদ্বান হল রহমত ও মাগফেরাতের মাস। আর সে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতটি হলো, এ মাসে নাজিলকৃত মহান আল্লাহর নিজস্ব বাণী পবিত্র কুরআন। এভাবে মানব জাতি পেয়েছিল মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত– মুক্তি ও সফলতার একমাত্র এবং সর্বশেষ পথ। ইসলামী পরিভাষায় যা হল সিরাতুল মোস্তাকিম। এর চেয়ে বড়ো ঘটানো মানব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টা নেই। মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এ কুরআনের বরকতেই। এই একটি মাত্র ঘটনাই রামাদ্বানের এই মাসটিকে অন্য যে কোন মাসের তুলনায় সম্মানিত করেছে। এ ঘটনাটির বরকতেই এ মাসে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন তাঁর বান্দাহর প্রার্থনা কবুল করাকে। এভাবে এ মহান মাসটি সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে খোদ মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে। এ মাসেই রয়েছে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রাত লাইলাতুল ক্বদর। দোয়া কবুলের এটিই শ্রেষ্ঠ রাত।

দোয়া কবুলের শর্ত হলো নেক আমল :

তবে দোয়া কবুলটিও নিঃশর্ত নয়। মহান আল্লাহর কাছে সে শর্তটি হলো, কুরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলীর পূর্ণ অনুসরণ। পবিত্র কুরআনে সে শর্তটি বলা হয়েছে এভাবে,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“..এবং যখন আমার বান্দাহরা আমার ব্যাপারে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, (তাদেরকে বলে দাও) বস্তুতঃ আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা আমি কবুল করি। অতএব তাদের অবশ্য পালনীয় হলো, আমার হুকুম পালন করা এবং আমার উপর ঈমান আনা।” (সুরা বাকারা : ১৮৬)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, তিনি প্রতিটি বান্দাহর অতি নিকটে। তিনি যে শুধু বান্দাহর প্রতিটি দোয়া শুনেন তাই নয়, সে দোয়া কবুলও করেন। সে ওয়াদাটিই অতি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতে। তবে সে সাথে তিনি সুস্পষ্ট শর্তও রেখেছেন। শর্ত হলো, তাঁর হুকুম পালন করা এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা। বান্দাহর বহু প্রত্যাশার জবাবে এটি হলো মহান আল্লাহর নূন্যতম প্রত্যাশা। আল্লাহর প্রত্যাশা পূরণে যে কোন ব্যর্থতা যে বান্দাহর জীবনে মহা আযাব ডেকে আনে– শুধু এ দুনিয়ায় নয়, অনন্ত-অসীম আখিরাতের জীবনেও– সে ঘোষণাটি পবিত্র কুরআনে এসেছে বার বার। কথা হলো, আজকের মুসলমানগণ কতটুকু সফল হচ্ছে সে শর্ত পূরণে। আল্লাহ তায়ালার যে কোন হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলো কুফরি। ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহর যে কোন হুকুম শোনা মাত্রই বলবে–

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

“শুনলাম এবং মেনে নিলাম”

আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ আযাব ডেকে আনে। একটি মাত্র হুকুম অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়েছে ইবলিস। মহান আল্লাহর নীতি বা ন্যায় বিচার এ নয় যে, তিনি তাঁর বিদ্রোহী বান্দাহর দোয়া কবুল করবেন এবং তার ঘরে কল্যাণ পৌঁছে দিবেন। কল্যাণ যে হচ্ছে না সে প্রমাণ কি কম? পরাজয়, ধ্বংস, অপমান, শত্রুর আধিপত্যসহ নানা রূপ পতিত-দশা নেমে এসেছে শুধু ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মির, চেচনিয়া বা সোমলিয়ায় নয়, অধিকাংশ মুসলিম দেশে।

রেকর্ড দুর্বৃত্তি ও বিদ্রোহে

নামাজ-রোজা নিয়মিত আদায় করে এমন মুসলমানদের সংখ্যা আজকের পৃথিবীতে কোটি কোটি। কিন্তু সে তুলনায় তাকওয়া অর্জিত হচ্ছে কতটুকু? কতটুকু বেড়েছে নেক আমল? মুসলিম দেশ হওয়ার বরকতে এটাই কি কাঙ্খিত ছিল না যে, এ দেশগুলি সুনীতি ও সৎকর্মে বিশ্বে রেকর্ড গড়বে? সৃষ্টি হবে নেক আমলের প্লাবন। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টোটি। দুর্নীতিতে তারা কাফেরদেরও হারিয়ে দিচ্ছে। নেক-আমলের বিপরীত হলো– মিথ্যা, সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, ব্যাভিচার, ঘুষ ও ধোঁকাবাজির ন্যায় নানাবিধ পাপাচার বা দুর্বৃত্তি। ইসলামী পরিভাষায় এ গুলো হলো মুনকার। অথচ মুসলিম দেশগুলিতে এগুলিই আজ প্রবলতর হচ্ছে না? ফলে রোজা যে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হচ্ছে না -এ হলো তার প্রমাণ। কিন্তু এ বিফলতা নিয়েই বা ক'জন ভাবছে? আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিদ্রোহই তো শয়তানের অনুসরণ। এমন বিদ্রোহে বিজয়ী হয় ও খুশি হয় শয়তান ও তার অনুসারিরা। অথচ প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশের শাসন ক্ষমতায় তো এ বিদ্রোহীরাই। প্রায় প্রতি দেশে চলছে শয়তানকে খুশি করার লাগাতর আয়োজন। আল্লাহর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের মিথ্যা,পাপ ও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে। প্রতিটি মুসলিম দেশে এমন বিদ্রোহীরাই ব্যর্থ করে দিচ্ছে আল্লাহর হুকুম তথা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার প্রতিটি উদ্যোগ।

শুরুতে মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র ছিল না, কিন্তু যেটি ছিল সেটি শরিয়ত তথা আল্লাহর আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর হুকুমকে তারা শুধু পাঠই করত না, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রয়োগও করত। কিন্তু আজ শুধু পাঠই হয়, প্রয়োগ নেই। মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে নানা ভাষা ও নানা জাতীয়তার নামে বহু জাতীয় ঝান্ডা। মুসলিম উম্মাহর সংহতি ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের নামে। এবং সে সাথে বেড়েছে আল্লাহর হুকুমের তথা শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডাও। সে ঝান্ডা উড়িয়েছে মুসলিম দেশের ব্যাংকগুলো সুদকে হালাল করে। বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়িয়েছে মুসলিম দেশের আদালতগুলোও, সেটি কুরআনি আইনের স্থলে কাফেরদের প্রণীত আইন প্রয়োগ করে। যে আইনে ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি এবং সমকামিতা কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। এই কি রোজার সফলতা? কোথায় সে তাকওয়া? আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলতে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। তারা সে ঝান্ডা তুলেছে পর্দার হুকুম অমান্য করে এবং নারী-পুরুষের মাঝে অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে। বেপর্দাগী নিজেই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা। আর যারা সে ঝান্ডা উড়িয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে তাদেরকে এসব নামাজি ও রোজাদারগণ বিপুল ভোটে নির্বাচিতও করে। তাদের পিছনে রাজপথে মিছিলও করে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহী তাদের ভোট দিলে বা তাদের রাজনীতিকে সমর্থন করলে কি নামাজ-রোজা পালনের কোন অর্থ থাকে?

মুসলিম দেশগুলিতে রোজাদারের সংখ্যা কোটি কোটি, কিন্তু কতটা বেড়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ সৈনিক? বরং অধিকাংশ মুসলমান যেন তাদের কর্ম, লেন-দেন, রাজনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের প্রতি তাদের পরোয়া নাই। তাদের কর্ম, রাজনীতি ও চাল-চলনে যেটি অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে সেটি হলো তাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থচিন্তা; আল্লাহর হুকুম নয়। আল্লাহর হুকুমকে তারা সীমাবদ্ধ করেছে জায়নামাজে, বিয়ে-শাদী ও মুর্দাদাফনে, মসজিদে এবং নামাজ-রোজা-হজ পালনে। নিজেদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন-আদালতের অঙ্গনে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহর বিধানের প্রয়োগ। মুসলমানের এমন আচরণ কি আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ নয়? এমন বিদ্রোহী বান্দারা পোষাক-পরিচ্ছদ ও নামে যতই মুসলমান হোক– যদি সারা বছর রোজা রাখে, যদি সারা রাত নামাজ পড়ে ও কেঁদে কেঁদে যদি সারা রাত মোনাজাত করে তবে সে ইবাদত ও মোনাজাত কি রাব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হয়? কবুল যে হচ্ছে না সে প্রমাণই কি কম? কবুল হওয়ার নমুনা কি এই– মুসলিম দেশে আগ্রাসী বিদেশি শক্তি আধিপত্য পাবে, নানা রূপ দুঃখদশা দিন দিন গভীরতর হবে, এবং মুসলমান নর-নারী প্রতিদিন নিহত, আহত, ধর্ষিতা ও পদপিষ্ট হবে?

রামাদানে দোয়া কবুলের শর্ত

রামাদ্বান মাসটি দোয়া কবুলের মাস। তিরমিজয শরিফের হাদিসে আছে; তিন ব্যক্তির দোয়া কখনই বৃথা যায় না। সে তিন প্রকার ব্যক্তি হলো– রোজাদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং যিনি মজলুম। কিন্তু দোয়া কবুলের শর্তও রাখা হয়েছে। একাধিক হাদিসে এসেছে, দোয়া কবুলের শর্ত হল দোয়াকারীর রিজিক অবশ্যই হালাল হতে হবে। অর্থাৎ তাকে সৎ হতে হবে। ফলে যে ব্যক্তির সেহরি ও ইফতার যদি হয় ঘুস, সুদ, মদবিক্রয়, জুয়া, ধোঁকাবাজি ও নানা দুনীতির মধ্য দিয়ে উপার্জিত অর্থে এবং বসবাস যদি হয় সুদি অর্থে কেনা বা সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে অর্জিত গৃহে, তবে তার দোয়া কি কবুল হয়? দোয়া কবুলের জন্য রোজাদার হওয়ার পাশাপাশি ঈমানদার হওয়াটিইও তো শর্ত। পবিত্র কুরআনে একবার নয়, বহুবার বলা হয়েছে, যারা ফাসেক ও জালেম তাদের দোয়া কবুল দূরে থাক, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েতই দেন না। হেদায়েত লাভের শর্ত হল, পাপের পথ তথা দুর্নীতি থেকে প্রথমে ফিরতে হবে। দৈহিক সুস্থ্যতার জন্য ঔষধের আগে বিষ-পান ত্যাগ যেমন জরুরি, তেমনি হেদায়াত লাভের জন্য জরুরি হলো পাপের পথ পরিহার। মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড়ো দান ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি বা প্রতিপত্তি নয়, বরং সেটি হেদায়াত। সে হেদায়াত লাভের জন্যই প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে "ইহদিনাস সিরাতুল মোস্তাকিম" বলে দোয়া করতে হয়। এর চেয়ে বড়ো দোয়া যেমন নেই, তেমনি হেদায়াত প্রাপ্তির চেয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বড়ো প্রাপ্তিও নাই। এই হেদায়াত প্রাপ্তিই ঈমানদারকে একজন কাফের থেকে আলাদা করে। হেদায়াত লাভের ফলেই সম্ভব হয় সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা। কাফের, জালেম ও ফাসেকের জীবনে সে হেদায়াত নাই বলেই তাদের জীবনে যেটি বাড়ে সেটি নিছক বিভ্রান্তি। এমন বিভ্রান্তিতে কেবল জাহান্নামে পৌঁছাই সম্ভব, জান্নাতে নয়। কারণ, জান্নাতের জন্য তো চাই সিরাতুল মোস্তাকিম। আর ফাসেক ও জালেম তো তারাই যারা দুর্বৃত্ত এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। ফলে যে দেশটি দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয় সে দেশের মসজিদগুলো

যতই মুসল্লি দ্বারা পূর্ণ হোক না কেন তারা কি রহমত পায়? হেদায়াত লাভের জন্য শুধু মুখে কালেমা পড়লেই চলে না। শুধু মূর্তিপূজা ছাড়াটাই যথেষ্ট নয়। দুর্নীতি ছেড়ে সুনীতি এবং দুষ্কর্ম ছেড়ে নেক আমলের পথও ধরতে হয়। দোয়া কবুল তো এ পথেই আসে।

সঠিক ঈমান সওমের পূর্বশর্ত

রোজার পরিপূর্ণ ফায়দা নিতে হলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়াটি জরুরি। রোজা পালনের কুরআনি আহবান তো এসেছে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করেই, জালেম-ফাসেক ও কাফের-মোনাফিকদের উদ্দেশ্যে নয়। মূল লক্ষ্য, ঈমানদারের তাকওয়া বৃদ্ধি। প্রাসাদ গড়তে ভিতটা প্রয়োজন, তাকওয়ার নির্মাণে ঈমান হলো সেই ভিত। তবে ঈমানদারির অর্থ শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করা নয়। মক্কার কাফেরগণও আল্লাহকে বিশ্বাস করত। তাদের সন্তানদের নাম নবীজীর (সা) জন্মের পূর্বেও আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান রাখত। কিন্তু কাফেরদের এ বিশ্বাস বেশিদূর এগুয়নি। এ বিশ্বাসে তাই তাকওয়া সৃষ্টি হয়নি, ফলে ব্যক্তি ও সমাজ কোনটাই বিশুদ্ধ হয়নি। আল্লাহর উপর ঈমান আনাতে ব্যক্তির জীবনে পরিশুদ্ধি শুরু হয় মাত্র, পরিপূর্ণ মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার জন্য মুসলমানকে পরিপূর্ণ অংশ নিতে হয় মহান আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পিত প্রশিক্ষণে। শুধু একদিন দুদিন নয়, প্রতিদিন এবং জীবনের সবগুলো দিন ধরে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জিহাদ হলো সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

রোজার ট্রেনিং এত অপরিহার্য কেন?

ভালো মানের কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার গড়ার জন্যও লাগাতর ট্রেনিং চাই। তেমনি ট্রেনিং চাই নিষ্ঠাবান মুসলমান গড়ার জন্যও। সে ট্রেনিংয়ের মূল কথা হলো জিহ্বা, পেট ও যৌনতার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ব্রেক ছাড়া কোন গাড়ি নির্মাণ ও সে গাড়িকে রাস্তায় নামানোর বিপদ ভয়াবহ। তাতে অনিবার্য হয় দুর্ঘটনা। তেমনি জিহ্বা, পেট ও যৌনতার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সভ্য সমাজ নির্মিত করা যায় না। জিহ্ববার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মিথ্যাচার, গীবত ও কলহ-বিবাদ থেকে নাযাত মেলে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে অশান্তির মূল কারণ হলো লাগামহীন জিহ্বা। তেমনি পেটের লালসার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পানাহারে অবাধ্যতা হয় শরিয়তি বিধানের। মানুষ তখন উপার্জনে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। তেমনি যৌন লালসার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ ব্যাভিচারের দিকে ধাবিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের ব্যাভিচারি মানুষগুলো তার নজির। নবীজী (সা.) বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে জিহ্ববা ও যৌনাঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে। রামাদ্বানের মাস ব্যাপী রোজা মূলত সে নিয়ন্ত্রণকেই প্রতিষ্ঠা করে। রামাদ্বানের রোজা যদি সে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনেই ব্যর্থ হয় তবে বুঝতে হবে রোজাদারের মাসব্যাপী ট্রেনিং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রোজা তাকে দিনভর উপবাসের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের রোজা যে তাদের জীবনে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আনতে পারিনি তা শুধু রামাদ্বানের মাসে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে ধরা পড়ে না, প্রকট ভাবে ধরে দুর্নীতির মধ্য দিয়েও।

সাওম মনের প্রশিক্ষণ দেয়

কোন প্রশিক্ষণই নিছক শারীরিক কসরতের বিষয় নয়। শরীরের সাথে চাই মনের সংযোগ। চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব আনতে পারে চাই এমন জ্ঞান। রামাদ্বানের দৈহিক প্রশিক্ষণের সাথে কুরআনের সে জ্ঞান আনে মনোজগতে বিপ্লব। পশু পশুরূপে জন্ম নেয়, মারাও যায় পশু রূপে। এদের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কোনরূপ চারিত্রিক বিপ্লব নেই। তাই পশুকুলে সমাজ গড়ে উঠে না, সভ্যতাও নির্মিত হয় না। কারণ পশু সমাজে পানাহার থাকলেও জ্ঞানের আয়োজন নেই। কিন্তু মানুষকে পশু থেকে ভিন্নতর ও উন্নততর হতে হয়। এবং সেটি জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে। এটিই জীবনের মূল সাধনা। নইলে মানুষরূপে জন্ম নিয়েও সে মারা যেতে পারে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে। পবিত্র কুরআনে এদের বিষয়েই বলা হয়েছে "উলায়িকা কা'আল আনয়াম, বাল হুম আদাল" তারাই পশুর ন্যায় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট"। অর্থাৎ এদের জীবনে উপরে উঠার কাজটাই হয়নি। বয়স বাড়ার সাথে তাদের ঈমান ও আমল বাড়েনি, বরং বেড়েছে নিচে নামাটি। অপর দিকে জ্ঞানসাধনায় অর্জিত উচ্চতর গুণে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হতে পারে। এবং সে সামর্থ অর্জনের কাজটি ব্যক্তিকে জীবনভর করতে হয়। উচ্চতর সমাজ ও সভ্যতা নির্মিত হয় তো এমন জ্ঞানবান মানুষের আধিক্যেই। আর এরূপ উচ্চতর মানুষ ও উচ্চতর সভ্যতার নির্মাণের মধ্য দিয়েই তো যাচাই হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সাম্রাজ্যবিস্তার বা আনবিক বোমা নির্মাণের সামর্থ দিয়ে সেটি হয় না। বস্তুতঃ ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আমৃত্যু আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি পায় নেক আমলের সামর্থ্য। নেক আমল তখন ব্যক্তির জীবন-সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এমন জীবন-সংস্কৃতির নির্মাণে রোজার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রোজা আনে জীবন যাপনে সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। আনে আল্লাহ সচেতনতা, এবং সেটি সমগ্র দিন জুড়ে। প্রতি ওয়াক্তের নামাজ মাত্র কয়েক মিনিটের।

এদিক দিয়ে রোজা সবচেয়ে দীর্ঘ ইবাদত। এবং সে ইবাদত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সংযমের মধ্য দিয়ে। একান্ত নির্জনেও ক্ষুধাগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে মুখে খাদ্য তুলে নেয় না। আল্লাহ যে সব কিছু দেখেন সে চেতনা এভাবেই রোজাদারের মনে আজীবন বদ্ধমূল হয়। সর্বকাজে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর এমন ভয় এবং এমন আল্লাহ-সচেতনতাই হলো তাকওয়া। এমন তাকওয়া অর্জিত হলেই বুঝতে হবে রোজাদারের রোজা সফল হয়েছে।

ব্যর্থ হচ্ছে কেন এ প্রশিক্ষণ?

সৈনিকের খাতায় নাম লেখালে বা প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হলেই কেউ ভাল সৈনিক রূপে গড়ে উঠে না। ভাল সৈনিক হতে হলে সৈনিক জীবনের মূল দর্শন ও মিশনের সাথেও তাকে সম্পূর্ণ একাত্ব হতে হয়। দেশের স্বাধীনতা ও সংহতিতে তাকে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হয়। এখানে আপোষ চলে না। সৈনিকের জীবনের মূল মিশন তো স্বাধীনতা ও সংহতির সংরক্ষণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রটিতেই যদি সংশয় থাকে তবে ভাল সৈনিক হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সৈনিকবেশি এমন ব্যক্তিটির পক্ষে তখন বিদেশি শত্রুর চর হিসাবে কাজ করাও তখন রুচিসিদ্ধ মনে হয়। এরাই তো মীর জাফর। কুরআনের কসম খেয়েও এরা গাদ্দারি করে। এরাই কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে নিজ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মুসলিম দেশকে এরা খণ্ডিত করে বা পরাধীন করে। এবং উল্লাস ভরে মুসলিম হত্যা করে। মুসলিম ইতিহাসে এমন বিশ্বাসঘাতক সৈনিকের সংখ্যা কি কম? তেমনি জীবনভর নামাজ-রোজা, হজ-যাকাতের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েও বহু মানুষের জীবনে পরিশুদ্ধি আসে না। পরিশুদ্ধি তো আসে নামাজ-রোজা, হজ-যাকাতের পাশপাশি জীবন ও জগত নিয়ে ইসলামের যে মূল দর্শন, তার সাথে একাত্ব হওয়ায়। কথা হলো, সে দর্শনটি কি? সেটি হলো, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, প্রতিপালক, আইনদাতা ও রিজিকদাতারূপে মেনে নেওয়া এবং তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নিজেকে একজন আত্মসমর্পিত সৈনিক রূপে পেশ করা।

মুসলমানের মিশন মূলতঃ আল্লাহর কাছে এক আত্মসমর্পিত গোলামের মিশন। সে গোলামি জীবনের দায়িত্বটি নিছক নামাজ-রোজা, হজ-যাকাতে পালিত হয় না। সে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রটি আরও বিশাল। এবং সেটি সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জুড়ে। দায়িত্বপালনের লক্ষ্যে কখনও তাকে দ্বীনের প্রচারক হতে হয়, কখনও রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হতে হয়, আবার কখনও সৈনিক বা জেনারেলের বেশে যুদ্ধও লড়তে হয়। মুসলমানের জীবনে এভাবেই তো আসে কামালিয়াত বা পূর্ণাঙ্গতা। মুসলিম শব্দটির উদ্ভব তো হয়েছে আত্মসমর্পণ থেকে, যার নমুনা পেশ করেছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)। যিনি আল্লাহর প্রতিটি হুকুমে– সেটি শিশু পুত্রের কুরবানি হোক বা নিজ দেশ ছেড়ে হিজরত হোক– সব সময়ই লাববায়েক (আমি হাজির এবং মেনে নিলাম) বলেছেন। নামাজ-রোজা, হজ-যাকাতের মত কুরআনি প্রশিক্ষণ তো এমন আত্মসমর্পিত মুসলমানদের জন্যই, বেঈমান ও মুনাফিকদের জন্য নয়। যারা জান্নাত চায়, আল্লাহ তায়ালার এ প্রশিক্ষণ তো তাদেরকে সে মহাপুরস্কার লাভের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে। প্রতিটি ঈমানদার যেমন এ প্রশিক্ষণ থেকে ফায়দা পায়, তেমনি এর সাথে একাত্মও হয়।

তাই আসুন!

প্রশ্ন হলো, কুরআনের জ্ঞান ছাড়া কি আল্লাহর নির্দেশিত প্রশিক্ষণ থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব? চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া কেউ কি কোন হাসপাতালে রোগ-চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিতে পারবে? তাই যদি সঠিক হয়, তাহলে প্রতিটি মু'মিনকে সাওম পালনের মাসে কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি তা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে এ কথা জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যে, এটি গাইডবুক হিসেবে এসেছে আমার-আপনার সবার হেদায়েতের বার্তা নিয়ে। যারা হেদায়েত লাভে ধন্য হবে তাঁরাই ভাগ্যবান, আর যারা কেবল পড়বে, কিন্তু হেদায়েতের কোন ধার ধরে না, তারাই ইহজগতে ব্যর্থতার জীবন কাটাবে এবং পরকালে আল্লাহর কাছে শরমিন্দা হয়ে উঠবে।

অনুকূল সময়ের পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হই

আলী আহমাদ মাবরুর

৫ আগস্ট বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। অবিস্মরণীয় একটি বিপ্লব, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ইতিহাস একটি চাকার মতো। এখানে ঘটনার যেমন পুনরাবৃত্তি হয়, অপশাসন যেমন বার বার ফিরে আসে, তেমনি অপশাসন থেকে মজলুমরা বিজয়ও ছিনিয়ে আনে প্রতিবারেই। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী শাসনের চূড়ান্ত বিদায় হয়েছিল ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। আর ২০২৪ সালে আওয়ামী শাসনের পতন ঘটলো ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিক কোনো পরিণতি নয়, বরং অভ্যুত্থানই যেন আওয়ামী লীগের শেষ পরিণতি।

বিজয়ের পর আওয়ামী বিরোধী বলয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস নেমে আসে। বেশিরভাগ দল এই বিজয়কে নিজেদের অর্জন বলে দাবি করতে শুরু করে। ইসলামপন্থী দলগুলোও একইভাবে এই ঘটনাকে বিজয় হিসেবেই অভিহিত করে। তারা এক ধাপ এগিয়ে এ বিজয়কে রাসুল (সা.) এর জীবনে ঘটে যাওয়া মক্কা বিজয়ের সাথেও তুলনা করেন। মক্কা বিজয় পরবর্তী রাসুল (সা.) ভাষণের মতোই ঔদার্যতার বহিঃপ্রকাশ তারাও ঘটাতে শুরু করেন। ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমা করে দেওয়ার মনোভাবও বেশ কিছু বক্তব্য ও বিবৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ লালনকারী ছাত্র সম্প্রদায় এই ধরনের উদারতা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

আমার কাছে এই বিজয়ের কনসেপ্টটাই সঠিক মনে হয়নি। বিশেষ করে ইসলামিস্টরা যেভাবে মক্কা বিজয় হিসেবে গোটা পরিস্থিতিকে চিত্রায়িত করেছেন, তার মর্মার্থও আমি অনুধাবন করতে পারেনি। এ বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে কোনো একটি ঘটনাকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হবে, এর প্রতিক্রিয়াও সেভাবেই দৃশ্যমান হবে। মূল্যায়নে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে প্রতিক্রিয়াতেও ভুল হওয়ার শঙ্কা রয়ে যায়।

আমার বিবেচনায় আমরা বিজয়ী হইনি। এই পরিস্থিতিকে বিজয় বলা ভুল হবে। কেননা ইসলামকে এখনো বিজয়ী অবস্থানে নেওয়া যায়নি। এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষকে ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা যায়নি। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঘরে পৌঁছানো যায়নি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নামে মুসলিম হলেও সাংস্কৃতিকভাবে দ্বীন ইসলাম অনুশীলনে এখনো মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। এ বাস্তবতায়, রাসুল (সা.) সীরাতের সাথে যদি ৫ আগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতি মেলাতেই হয়, তাহলে আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিকে ওহুদের যুদ্ধের প্রথম ধাপের সাথে মেলানো যায়। ওহুদের যুদ্ধেও প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিজয়ই হয়েছিল। এর পরে সে যুদ্ধের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল তা আমাদের সবারই জানা।

ওহুদের দৃষ্টান্ত থেকে আমি স্পষ্টভাবেই মনে করি, যদি আমরা গণীমতের সম্পদের লোভ ত্যাগ করতে পারি, যদি আনুগত্য, কুরবানি ও শৃঙ্খলার চূড়ান্ত নজরানা স্থাপন করতে পারি, তাহলে হয়তো আমরা চূড়ান্ত বিজয় পানে অগ্রসর হতে পারবো। কিন্তু এর অন্যথা হলে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, পাহাড়ের ওপারে শত্রুরা আমাদের একটু ভুল করার জন্য অপেক্ষা করছে। ভুল করা মাত্রই তারা পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে যুদ্ধের প্রথম ধাপের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেবে। বাংলাদেশের দৃশ্যপটে অপেক্ষমান শত্রুর তৎপরতা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আমার বিবেচনায় আমরা বিজয়ী হইনি; তবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুকূল একটি সময় দিয়েছেন। বলা যায়, বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের জন্য বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী শিবিরের জন্য এত বড়ো সুযোগ এর আগে কখনো আসেনি। আমার যেহেতু ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়টাও দেখার সুযোগ হয়েছে, তাই বলতে পারি ঐ সময়ের তুলনায়ও আমাদের জন্য অধিকতর অনুকুল একটি সময় আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। ২০০১-২০০৬ সালে জামায়াতের মাত্র দুজন শীর্ষ নেতা সরকারে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। মন্ত্রীসভায় যেমন তারা মাইনোরিটি ছিলেন তেমনি অন্যান্য প্রশাসনিক পর্যায়েও জামায়াতের অবস্থান ছিল নগণ্য। কিন্তু এবার জামায়াত-শিবির অনেকটা ক্ষমতাসীন দলের অবস্থানে আছে। সর্বত্র জামায়াত নিয়েই আলোচনা। প্রশাসনে, আলোচনায়, সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে কিংবা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে– সবখানেই জামায়াতের সরব উপস্থিতি। গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদেই জামায়াতের সমর্থকেরা নিয়োগ পেয়েছেন বলেই দাবি করা হচ্ছে।

সেদিন একজন জেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলের কথা হচ্ছিল। বললেন, 'তদবিরের চাপে অস্থির হয়ে আছেন'। এমনকী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও তদবিরের মধ্যেই ডুবে আছেন। 'জামায়াত বাংলাদেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল; সামনের দিনে ক্ষমতায় আসবে; ক্ষমতায় না আসলেও অন্তত প্রধান বিরোধী দল তো হবেই'– এমন একটি অভিমত নানা মহলেই চালু রয়েছে। মিডিয়া পাড়ায় বলা হচ্ছে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জামায়াতের। এ কারণেই জামায়াতের ব্যাপারে জনপ্রত্যাশাও বেড়ে গেছে অনেক।

জামায়াতের এই সুবিধাজনক অবস্থানে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্য অস্বাভাবিকও নয়। যেহেতু ফ্যাসিস্ট শাসনে জামায়াত শিবির সবচেয়ে বেশি কোনঠাসা অবস্থানে ছিল, তাই জগদ্দল পাথরটি সরে গেলে এবং খুব ব্যতিক্রম কিছু না ঘটলে জামায়াত শিবিরেরই সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক জায়গায় যাওয়ার কথা।

ইতিহাসের গতি প্রকৃতি তাই বলে। তাছাড়া জামায়াতের আজকের এই জনপ্রিয় অবস্থানের নেপথ্যে রাজনৈতিক সমীকরণের বাইরেও কাজ করেছে আধ্যাত্মিক হিসেব নিকেষ। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস বলে, যে মাটিতে শহিদের রক্ত ঝড়ে, সে মাটি ইকামাতে দ্বীনের জন্য উর্বর হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন অনেক দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও একটি বড়ো ধরনের ঘাটতি ছিল। এ আন্দোলনের জনশক্তি অনেক আগে থেকে শাহাদাতের নজরানা পেশ করলেও দায়িত্বশীল পর্যায়ে শাহাদাতের খুব বেশি দৃষ্টান্ত ছিল না। বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সেই ঘাটতিও পূরণ হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্ব আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একদমই অভূতপূর্ব একটি ঘটনা যেখানে একটি আন্দোলনের ১১ জন শীর্ষ নেতাকে জুলুমের মধ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়েছে– যার মধ্যে সংগঠনের এক নাম্বার ব্যক্তিসহ ৫ জনকে ফাঁসি কার্যকরের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। কারাগারের প্রিজন সেলে হত্যা করা হয়েছে আরও ৫ জন নেতাকে।

এই প্রেক্ষাপটে, নিঃসন্দেহে বিপ্লব পরবর্তী এই পরিস্থিতিটি ইসলামপন্থীদের জন্য অনেক বেশি সংবেদনশীল। চাইলে অনুকূল এই সময়টি কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আবার ভুল করলে অনেক বড়ো একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও আছে। যেমনটা ওহুদের যুদ্ধের রেফারেন্স দিয়ে একটু আগেও উল্লেখ করেছি। তাই এই অনুকূল পরিস্থিতিকেই চূড়ান্ত মনে করা উচিত নয়। ইতিহাস আমাদের সবার সামনেই উপস্থিত। ইতিহাসের একটি বড়ো শিক্ষা হলো, "মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।"

ইতিহাস আমাদেরকে জানিয়ে দেয়, কোনো পরিস্থিতিই চূড়ান্ত নয়। প্রতিকূল অবস্থা যেমন টিকে থাকতে পারেনি, বিদায় নিতে হয়েছে। তেমনি অনুকূল পরিস্থিতিও স্থায়ী কোনো বিষয় নয়। তা্ই আজকের যে সহজ ও অনুকূল সময়টি বিদ্যমান রয়েছে– এটাকে স্থায়ী মনে করা হবে ঐতিহাসিক ভুল। বরং এ পরিস্থিতি বেশিদিন থাকবে না এবং আগের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি যদি আল্লাহ না করুন, তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমরা কীভাবে তা মোকাবেলা করবো– সে প্রস্তুতি এখন থেকেই নেওয়া উচিত। প্রতিকূল সময়ে যে বিষয়গুলো করা যায়নি,

যে অপ্রাপ্তিগুলো নিয়ে তখন আফসোস বিদ্যমান ছিল, যে ঘাটতিগুলো তখন অনুভূত হয়েছিল সেগুলো যেন দূর করা যায়– তা নিশ্চিতে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি এখন থেকেই গ্রহণ করা জরুরি।

এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সবসময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত।আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং শাহাদাতের তামান্না লালনের বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত আমাদেরকে আচার আচরণে, কথাবার্তায়, কার্যক্রমে, মাইন্ডসেট তৈরিতে অনেক বেশি সংযত ও দূরদর্শী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতা তৈরি না হলে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দেন না। অনেকেই ইনক্লুসিভ হওয়ার কথা বলছেন। মূলধারায় কাজ করা এবং নানা চিন্তার নানা মানুষের সাথে সমন্বয় করে চলার সুপারিশও এসেছে নানা মহল থেকেই। এক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশক্ষেত্রে বিরোধী অবস্থানগুলোর সাথে এডজাস্ট করার কথা বলি। সবার কথা শোনার ও গ্রহণ করার মানসিকতাও লালন করার কথা বলা হচ্ছে। আমার মতে, বিরোধীদের পাশাপাশি নিজ দলের তৃণমূলের জনশক্তির কথাও বলা উচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, প্রতিটি দলে এমনকী আদর্শিক দলেও নানা ধরনের চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। চিন্তাধারাগুলোকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্যও রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রতিকূল পরিবেশে দলগুলো নানা ধরনের চড়াই উৎড়াই এমনকী ভাঙ্গনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, অনুকূল পরিবেশে প্রত্যাশিত সংস্কার ও উৎকর্ষতা সাধন করার চেয়ে বরং বৈষয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলেই বিভোর হয়ে যায়। এর পাশাপাশি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবে নানা ধরনের চিন্তার বিস্ফোরণও দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা বিষয়ে চিন্তা ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া গণ পরিসরে কাজ করার সহজাত যে সব বিড়ম্বনা রয়েছে তাও ক্রমশ সামনে চলে আসছে। এই বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার সমন্বয় এবং সকলকে ন্যূনতম সন্তুষ্ট করে কাজ চালিয়ে নেওয়াও প্রতিটি দলের জন্য বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। অভ্যন্তরীণ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে তা দলগুলোকে যেমন বিপর্যয়ের মুখে ফেলবে তেমনি ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনের পথও ত্বরান্বিত হবে।

তবে শুধুমাত্র কৌশল দিয়েই বিজয় আসবে না। বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য যেমন লাগবে। তেমনি আমাদেরকেও অনেক বেশি উদার, যোগ্য ও দূরদর্শী হতে হবে। দায়িত্বশীল ও জনশক্তি সব মহলেই এই বিষয়গুলো বিবেচ্য হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে; খারাপ বা ভালো– সব পরিস্থিতিই আল্লাহ পরীক্ষা হিসেবেই দেন– আমরা যেন তা ভুলে না যাই। অনুকূল পরিবেশ মুমিনের জন্য অনেক সময়ই পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কখনও বিপদ দিয়ে, কখনও আবার আরাম-আয়েশ বা অনুকূল পরিবেশ দিয়ে। সাধারণত আমরা মনে করি, কষ্ট বা দুঃখই শুধু পরীক্ষা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আরাম-আয়েশ, প্রাচুর্য এবং অনকূল পরিস্থিতিও বড়ো ধরনের পরীক্ষা। এর একাধিক কারণ বা প্রেক্ষিত রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আরামদায়ক পরিবেশে মানুষ অনেক সময় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়। ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ কমে যেতে পারে। তাছাড়া অনুকূল পরিবেশে মানুষ অহংকারে নিমজ্জিত হতে পারে। নিজের সাফল্যকে নিজের যোগ্যতার ফল মনে করে এবং আল্লাহর দান হিসেবে দেখতে ব্যর্থ হয়। অনুকূল সময়, প্রাচুর্য এবং বিলাসী জীবন মানুষকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করতে পারে। মুমিনের কাছে তাই অনুকূল সময় বড়ো একটি পরীক্ষা, যেখানে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যাচাই হয়।

সম্ভাব্য এই সংকটগুলো থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করা যায়। যথা:

- অনুকূল পরিস্থিতিতে, আনন্দ ও প্রাচুর্যের মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর দেওয়া নেয়ামত সঠিক পথে ব্যবহার করা দরকার।
- একইসাথে, অহংকার এড়িয়ে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা এবং নিজের সাফল্যকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য করা।
- নিজেদের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করা এবং অনুকূল পরিবেশে আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা।
- রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তারবিয়াতের কার্যক্রম জোরদার করা।
- অনুকূল পরিস্থিতিকে আল্লাহর দেওয়া আমানত হিসেবে ধরে নিয়ে সেই আমানতের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা।
- আর সর্বোপরি ইসলামকে জানার, অনুসরণ ও অনুশীলন করার এবং সমাজের সর্বত্র ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে জীবনের মিশন হিসেবে নির্ধারণ করা।

আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এবং অনুকূল সময়ের হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক।

রোজা ফরজ হওয়ার ইতিহাস

এনামুল করীম ইমাম

হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করার পরে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। এটা শুকরিয়া হিসেবেও হতে পারে। আবার তাওবা হিসেবেও হতে পারে। চাঁদের হিসেবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই রোজা রাখতেন। কারণ, এই দিনগুলোতে চাঁদ পূর্ণতা পায়।

বলা হয়, একবার তিনি পানিতে নিজের চেহারা দেখে বুঝতে পারেন যে জান্নাতের সৌন্দর্য ও লাবণ্য তিনি এখানে পাননি। তখন তিনি দুঃখিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ, জান্নাতের পোশাকও আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবার সৌন্দর্য ও লাবণ্যও দেওয়া হয়নি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি মাসে তিনটি রোজা রাখো। তিনি এই রোজা রাখতে শুরু করেন, যার বদৌলতে আগের মতো জান্নাতি রূপ-লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য ফিরে পান। অবশ্য আলোচ্য বক্তব্যের কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেভাবেই হোক, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে রোজার ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তার পরবর্তী যুগে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এই রোজা রাখতেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও রোজা রাখতেন। এ ব্যাপারে হাদিসে নববিতেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনে গমন করেন, তখন তিনি ৪০ দিন রোজা রাখেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার রাজত্বও দিয়েছিলেন। আবার নবুয়তও দিয়েছিলেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন ইফতার করতেন। বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন। হাদিসে নববিতে একে রোজা রাখার উত্তম পদ্ধতি বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন– আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রোজা হলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিয়মে রোজা পালন করা। তিনি একদিন সওম পালন করতেন, আরেক দিন বিরত থাকতেন। (সহিহ বুখারি : ১১৩১)

হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালামও রোজা রেখেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও দুই মাসের রোজা রাখতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণরাও ৪০টি রোজা রাখেন। অতএব, বোঝা গেলো প্রত্যেক ধর্মে ঋধংঃরহম (রোজা) ইবাদত রয়েছে। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় ঋধংঃরহম (রোজা) শিরোনামের অধীনে লেখা হয়েছে, 'আমরা দুনিয়ার এমন কোনও ধর্ম পাইনি, যে ধর্মে রোজার ইবাদত নেই।'

আশুরার রোজা

হিজরত করে মদিনায় আসার কিছু দিন পর থেকেই মুসলিমরা

আশুরার রোজা পালন করতে শুরু করেন। এই সময় আশুরার রোজাই তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন দেখতে পান, ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তাদের রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, এই দিনেই আল্লাহ তাআলা মুসা ও বনি ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ওই দিনের সম্মানে রোজা পালন করি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা আলাইহিস সালামের বেশি নিকটবর্তী। এরপর তিনি সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯৪৩)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জাহেলি যুগে কুরাইশরা আশুরার রোজা পালন করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই রোজা পালন করতেন। যখন তিনি মদিনায় আগমন করেন তখনও এই রোজা পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রামাদ্বানের রোজা ফরজ করা হলো তখন আশুরার রোজা ছেড়ে দেওয়া হয়। যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না। (সহিহ বুখারি : ২০০২)

বেশিরভাগ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মতে, রামাদ্বানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল, যা পরবর্তী সময়ে নফলে পরিণত হয়। আর প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার বিধান সবসময় মুস্তাহাব ছিল।

রামাদ্বানের রোজা

দ্বিতীয় হিজরিতে রামাদ্বানের রোজা ফরজ হয়। এই হিসাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৯ বছর রামাদ্বানের রোজা পালন করেছেন। (আল-মাজমুআ : ৬/২৫০)

প্রথমে ইচ্ছাধিকার ছিল

রামাদ্বানের রোজা যখন প্রথম ফরজ হয়, তখন রোজা রাখা ও ফিদিয়া দেওয়ার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়। এরশাদ হচ্ছে– “(তোমাদের ফরজ করা হয়েছে) রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদের মারাত্মক কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য হলো, এর পরিবর্তে ফিদিয়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। অবশ্য রোজা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।” (সুরা বাকারা : ১৮৪)

ফরজ বিধান

এরপর কোনও প্রকার অবকাশ না রেখেই রোজা ফরজ করা হয়। এরশাদ হচ্ছে– “রামাদ্বান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোজা পালন করে। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।” (সুরা বাকারা : ১৮৫)

সময় রদবদল

রামাদ্বানের রোজা যখন ফরজ হয়, তখন কেবল রাতের বেলা এশার নামাজ বা ঘুমের আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের সুযোগ ছিল। এশার নামাজ বা ঘুমের পর পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা সময় সংক্ষিপ্ত করে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার সময় নির্ধারণ করেন। এরশাদ হচ্ছে– “রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা থেকে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। (সুরা বাকারা : ১৮৭)

এভাবেই ধারাবাহিকভাবে রোজা ফরজ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে রোজা রাখার তাওফিক দান করুন।

লেখক : ইতিহাস গবেষক ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

মুসলমানদের সোনালী অতীত
(৫ম পর্ব)
আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে মুসলিম বাহিনী চৌদিকে সফলতা অর্জন করেছেন। যার ফলে অর্ধ পৃথিবীর (১,৫০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার) মানুষের কানে তাকবিরের সুমহান ধ্বনি পৌঁছে যায়। বিশাল সম্রাজ্যের নন্দিত খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক-এর মৃত্যুর পর মুসলিম সম্রাজ্যের সপ্তম উমাইয়া খলিফা হন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পুত্র ও খলিফা প্রথম ওয়ালিদের ছোটো ভাই সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক। সুলায়মান ৭১৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার পুরো খিলাফতকাল ফিলিস্তিন থেকে পরিচালনা করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানটি ছিল মুসলমানদের একটি সম্মিলিত স্থল ও সমুদ্র অভিযান। ৭১৬ সালে সুলাইমান ইবনে মুয়াদ আল আনতাকির নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। সেখানে ১,২০,০০০ সৈন্যসহ ১৮০০টি জাহাজ এবং অবরোধের ইঞ্জিন ছিল। অগ্নিসংযোগকারী উপকরণ (ন্যাপথা) মজুদ করার কথাও জানা যায়। শুধু সরবরাহকারী ট্রেনটিতে ১২০০০ জন পুরুষ, ৬০০০ উট এবং ৬০০০ গাধা ছিল বলেও তথ্য রয়েছে।

মুসলিম সেনাবাহিনী ৭১৭ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে থ্রেসে প্রবেশ করে এবং শহরটি অবরোধ করার জন্য অবরোধ লাইন তৈরি করে। যেটি বিশাল থিওডোসিয়ান প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মুসলিম বাহিনীর হাতে নৌবহর ছিল, যেটি স্থল সেনাবাহিনীর সাথে সমুদ্রপথে শহর অবরোধের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু অস্বাভাবিক ভয়াবহ শীতকালীন দুর্ভিক্ষ ও রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে ১৫ আগস্ট, ৭১৮ সালে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় মুসলিম বাহিনী। অবরোধ তুলে ফেরার পথে নৌবহরটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে মুসলিম বাহিনী তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যার কারণে অনেকেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তবে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ক্রমাগতভাবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়ে পশ্চিমে ইবেরিয়ান উপদ্বীপ, পূর্বে ট্রান্সঅক্সানীয়া ও উত্তর ভারত পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৭১৭ সালের সেপ্টেম্বরে খলিফা সুলায়মানের মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ও উপদেষ্টা উমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা মনোনীত হন। উমাইয়া খলিফা উমরের পিতা আবদুল আজিজ খলিফা আবদুল মালেকের ভাই ছিলেন এবং মাতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নাতনি। চারিত্রিক দিক থেকে হজরত উমর (রা.)-এর সাথে মিল থাকায় উমর ইবনে আবদুল আজিজকে দ্বিতীয় উমর বলা হতো। উমাইয়া বংশের ইতিহাসে উমর ইবনে আবদুল

আজিজের খলিফা হওয়া সত্যিই একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। নানাবিধ সমস্যায় যখন উমাইয়া খিলাফত বিপর্যয়ের মুখোমুখি, ঠিক সে সময় তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কারণ, খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে তিনি হেজাজের শাসনকর্তা ছিলেন। এ সময় তিনি ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, চারিত্রিক মাধুর্য, ধর্মপরায়ণতা ও প্রজাবাৎসল্য দ্বারা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি বর্জন করেন এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের মৌলিক ইসলামি আদর্শগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। আর এ কারণেই তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

খলিফা দ্বিতীয় উমরের শাসননীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য

প্রথমত

সমরনীতির পরিবর্তে শান্তি ও সংরক্ষণ নীতি অক্ষুণ্ন রাখা। কারণ তার মতে, সংরক্ষণ করতে না পারলে রাজ্য সম্প্রসারণ কেবল নিরর্থকই নয়; বরং বহুবিধ সমস্যায় নিপতিত হবে।

দ্বিতীয়ত

তিনি স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি, দল ও পক্ষপাতিত্ব নীতিকে পরিত্যাগ করেন। ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু খলিফা উমাইয়া বংশের প্রতি কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ না করে সকল শ্রেণির প্রজাকে সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। মানবতার সেবা এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণই ছিল খলিফা দ্বিতীয় উমরের শাসনের মূলমন্ত্র। অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি অত্যাচারী, লোভী ও অযোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করে তদস্থলে বিশ্বস্ত, পরোপকারী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেন। কেননা, তিনি দলীয়, গোত্র ও বংশীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় উমরের পূর্ববর্তী শাসকদের কেউ কেউ হিমরীয় অথবা মুদাবীয় গোত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় উমর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের নীতি পরিহার করে সমতা, নিরপেক্ষতা ও কল্যাণকর নীতির বশবর্তী হয়ে হিমরীয় ও মুদাবীয় উভয় গোত্র থেকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

তার অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ছিল তিনি দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শাসনকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতেন।

তিনি কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশাসকদের এরূপ নির্দেশনামা দেন, 'তোমাদের জেনে রাখা কর্তব্য যে, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতা দ্বারাই ধর্মের প্রতিপালন হয়ে থাকে। কোনো পাপকেই ছোটো করে দেখা উচিত নয়। জনাকীর্ণ স্থানকে জনশূন্য করতে চেষ্টা করো না। জনসাধারণের সাধ্যাতীত কোনো কিছুই করার চেষ্টা করো না। তারা যা দিতে পারে, তা-ই গ্রহণ করো। কীভাবে জনসংখ্যা এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা যায়, তার চেষ্টা করবে। নম্র ও নিষ্ঠুরভাবে শাসন করবে। উৎসব উপলক্ষ্যে কোনো উপঢৌকন গ্রহণ করো না। জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে, তার মূল্য গ্রহণ করো না। পর্যটক, বিবাহ, উষ্ট্রের দুগ্ধের ওপর কোনো কর ধার্য করো না। যে ইসলাম ধর্ম সানন্দে গ্রহণ করেছে, তাকে জিজিয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করো না।'

ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যজ্ঞান, জনকল্যাণ, ইসলামের প্রতি অনুরাগ, সাম্য ও সমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দ্বিতীয় উমর জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেন। কথিত আছে, খলিফা হওয়ার পূর্বে তিনি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফত লাভ করার পর মাত্র ২০০ দিনার মূল্যের সম্পত্তি রেখে বাকি সমুদয় সম্পত্তি জনকল্যাণে দান করেন। তিনি উমাইয়াকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ বাইতুলমালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার স্ত্রী ফাতিমাকে পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মণি-মুক্তাখচিত অলংকারাদি বাইতুলমালে জমা দিতে বললে স্ত্রী সানন্দে তার আদেশ পালন করেন। রাজকীয় অশ্বশালার অশ্বগুলো খলিফার নির্দেশে বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ বাইতুলমালে জমা রাখা হয়।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ফাদাক বাগানটি হস্তান্তরের মাধ্যমে–

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফাদাক বাগানটি বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বাগানটি হজরত ফাতিমা (রা.)-কে দান করেছিলেন। কিন্তু খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর কাছ থেকে তা নিয়ে নিয়েছিলেন। তবে ফাদাক অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে খলিফা মসনদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

উমাইয়াদের অষ্টম খলিফা দ্বিতীয় উমর খিলাফত লাভের পর বাগানটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গের কাছে হস্তান্তর

করেন। এ বাগান থেকেই তাঁদের ভরণপোষণ চলত। সকল দিকে ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। তার সময়ে উমাইয়া খিলাফতের চরম শত্রু খারিজি সম্প্রদায় শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেনি। কারণ, তিনি খারিজিদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের দাবিদাওয়া ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং তাদের সাথে কার্যকর সমঝোতা করেন। মহান খলিফা দ্বিতীয় উমর ২২ সেপ্টম্বর, ৭১৭ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ৭২০ সাল পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আলেপ্পো বিলাদ আল শামে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজের পর উমাইয়া খিলাফতের নবম খলিফা হিসেবে মনোনীত হন আবদুল মালেকের পুত্র ইয়াজিদ; যিনি দ্বিতীয় ইয়াজিদ নামে পরিচিত। ৭২০ সাল থেকে ৭২৪ সাল পর্যন্ত তার খিলাফতকাল ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তিনি খারেজিদের সাথে আলোচনায় না বসে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, এতে খারেজিদের নেতা শাওদাব নিহত হয় এবং দ্বিতীয় ইয়াজিদ বিজয় লাভ করে।

উমর ইবনে আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর ইয়াজিদ ইবনে আল মুহাল্লাব বন্দিদশা থেকে পালিয়ে ইরাক চলে যান এবং সেখানে জনসমর্থন তৈরি করে দ্বিতীয় ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।

মুহাল্লাব প্রথম দিকে সফল হলেও পরে তিনি মাসলামা ইবনে আবদুল মালেকের সেনাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। আল আন্দালুস (ইবেরিয়ান উপদ্বীপ), উত্তর আফ্রিকা ও সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আফ্রিকায় ইয়াজিদ ইবনে মুসলিমকে অপসারণ করে পূর্ববর্তী গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং খলিফার সমর্থন লাভ করেন। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে দ্বিতীয় ইয়াজিদের গভর্নর আল জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ ৭২২ সালে ককেশাসের দিকে অগ্রসর হন এবং বালানজার অধিকার করেন। মূলত উমাইয়াবিরোধীরা খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময় থেকে সুসংগঠিত হতে থাকে। যার ফলে উমাইয়দেরকে ৭৫০ সালে উৎখাত করতে সক্ষম হন। চৌমুখী চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনাকালে দ্বিতীয় ইয়াজিদ ৭২৪ সালে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর দশম খলিফা মনোনীত হন তার ভাই হিশাম ইবনে আবদুল মালেক। ৭২৪ সাল থেকে শুরু করে ৭৪৩ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি খিলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি হিমারীয়দের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে মুদারীয়দের ক্ষমতাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। তিনি হিমারীয় গোত্রের খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল বসরিকে ইরাকের এবং খালিদের ভাই আসাদ আল হোবায়রা-কে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, হিমারীয় ও মুদারীয় দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ও উত্তর আরবের অধিবাসী।

হিমারীয় বংশের শাসক খালিদ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে কৌশলে হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্বের নিরসন করেন। তার সময়ে খারিজিরা বিদ্রোহ করলে তিনি খারিজিদের কঠোর হস্তে দমন করেন। দীর্ঘ পনেরো বছর কৃতিত্বের সাথে শাসন পরিচালনা করলেও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে খালিফা তাকে অপসারণ করেন। ৭৩৯ সালে জায়েদ নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে বিদ্রোহ করলে নবনিযুক্ত শাসক তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

খোরাসানে বিদ্রোহ দমন

জিজিয়া কর দেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খোরাসানের সাগোদের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেননা, মুসলমানদের জিজিয়া কর দিতে হতো না; কিন্তু পরবর্তী সময়ে নওমুসলিমদের ওপর জিজিয়া ধার্য করলে তারা হারিসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের আবেদনে খাকানের নেতৃত্বে তুর্কিরাও এগিয়ে আসে। ৭৩৮ সালে খোরাসানের শাসনকর্তা আসাদ ই কাসরি খাকানকে এক যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে।

খাজারদের বিদ্রোহ দমন

খাজার সম্প্রদায়ের তুর্কিগণ ককেশীয় পর্বতের উত্তরে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে বসবাস করত। ৭২৭ সালে তারা আর্মেনিয়া ও কন আক্রমণ করলে সেখানকার গভর্নর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। ৭৩১ সালে তারা মসুল আক্রমণ করে সেখানকার গভর্নর জাররাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ সংবাদ পেয়ে খলিফা হিশাম সাইদ খাজারদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে তাদের পরাস্ত করেন।

উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহ

উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সহযোগিতায় সেখানকার খারিজিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৭৩৮ সালে তারা তান্জনীয়ার শাসককে হত্যা করে রাজধানী কায়রোয়ান আক্রমণ করেন। পরবর্তীতে সেনাপতি খালিদ ইবনে হাবিবকেও পরাজিত ও হত্যা করেন। অবশেষে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা হানজালা

ইবনে সাফওয়ান ৭৪৩ সালে বার্বার ও খারিজিদের পরাজিত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

গ্রিকদের প্রতিরোধ

গ্রিকরা এশিয়া মাইনরে গোলযোগ সৃষ্টি করলে আলু বাত্তাল নামক একজন আরব সেনাপতি তাদের প্রতিরোধ করে। অবশ্য এর পূর্বে খলিফার দুই পুত্র গ্রিকদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ জয়

খলিফা হিশাম নৌবাহিনীর সাহায্যে ৭৩৪ সালে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সার্ডিনিয়া দখল করেন। খলিফা হিশামের খিলাফতকালে আফ্রিকা ও স্পেনে বিশৃঙ্খলার সুযোগে আব্বাসিগণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। খোরাসানে তুমুল বিদ্রোহ শুরু করলে দমনে ব্যর্থ হন খলিফা হিশাম। সময়ের ব্যবধানে এ আন্দোলন থেকেই উমাইয়া বংশের পতন হয়; যদিও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ এবং স্পেনে উমাইয়াদের শাসন চালু ছিল আরও কয়েক শতক। খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী, বিচক্ষণ শাসকও ছিলেন। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের পর এগারোতম খলিফা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন তার ভাতিজা ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ; যিনি দ্বিতীয় ওয়ালিদ নামে পরিচিত। তিনি ৭৪৩ সাল থেকে ৭৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

তার সময়ে জায়েদ ইবনে আলির পুত্র ইয়াহিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তৎকালীন গভর্নর উমর ৭৪৩ সালে তাকে হত্যা করেন। এটিকে উমাইয়াদের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়।

উমাইয়া খিলাফতকালের চরম ক্রান্তিলগ্নে খলিফা হন ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ বা তৃতীয় ইয়াজিদ; যিনি ৭৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে ৩ বা ৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস খিলাফত শাসন করেন। এ সময়ের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খিলাফতের দায়িত্ব নেন প্রথম ওয়ালিদের পুত্র ইবরাহিম ইবনে ওয়ালিদ। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত ৭৪৪ সালে তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শাসন করেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ভয়ে তিনি আত্মগোপনে থেকেই দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে উমাইয়া গোত্রের নেতৃত্ব সুফয়ানি শাখা থেকে মারওয়ানি শাখায় হস্তান্তর হয়। খিলাফতের দায়িত্ব নেন মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান বা দ্বিতীয় মারওয়ান। তিনি ছিলেন দামেশকের উমাইয়া খিলাফতের শেষ খলিফা। তার খিলাফতকাল ৭৪৪ থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সম্পদ ও লোকবল কমে আসায় উমাইয়ারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্তভাবে আব্বাসীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়।

উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি আরব্য অঞ্চলে মুসলমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও নাটকীয় অধ্যায়।

উমাইয়া শাসকদের বিলাসিতা, আভিজাত্য প্রীতির কারণে আরবদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পারস্য, ইরাক ও মাওয়ালি (অ-আরব মুসলমান) জনগোষ্ঠী শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আর ঠিক এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আবু আল-আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহর নেতৃত্বে আব্বাসীয় বাহিনী ৭৫০ সালে উমাইয়া বাহিনীকে পরাজিত করে, আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয় বংশ, যাঁরা হলেন রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।

উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপে ইসলামের আগমন ও মুসলিম আমিরাত

অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে আলোর সন্ধান দিতে যে কাফেলা বের হয়েছে নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে। সে কাফেলার সাথিরা মক্কা থেকে মদিনা হয়ে সিরিয়া, দামেশক থেকে খিলাফত পরিচালনা করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন অর্ধ পৃথিবীর মানুষের কাছে। সমগ্র মানবজাতির নিকট ভিন্ন একটা পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেন মুসলিম জাতি। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত সকল সভ্যতাকে পেছনে ফেলে যখন মুসলিম সভ্যতার জয়জয়কার অবস্থা, ঠিক তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের নির্যাতিত মানুষ ইসলামকে স্বাগত জানান। উমাইয়া খিলাফতকালে আবদুল্লাহ ইবনে নাফি, মুসা ইবনে নুসাইর ও বীর সিপাহসালার তারিক ইবনে জিয়াদের দুর্দান্ত সাহস ও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন। দামেশক থেকে উমাইয়া খিলাফত পতনের পর প্রথম আবদুর রহমান দামেশক থেকে স্পেনে এসে আমিরাত অব কর্ডোভা নামে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বৃহৎ মুসলিম খিলাফতের শাসনভার তখন আব্বাসীয়দের হাতে। ইউরোপের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত আল আন্দালুসে প্রথম আবদুর রহমানের আগমনে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ তাকে স্বাগত জানাননি এবং সহজে আনুগত্য মেনে নেননি। মহাবীর তারিক ইবনে জিয়াদ-এর

৭১১ সালে স্পেন বিজয়ের পর থেকে ৭৫৬ সালে প্রথম আবদুর রহমান-এর আগমন পর্যন্ত আল আন্দালুস মুসলিম খিলাফতের খলিফার আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হতো।

একনজরে পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম শাসনামল ভৌগোলিক এলাকাগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো :

আল আন্দালুস ৭১১-১৪৯২ সাল
আমিরাত অফ কর্ডোভা ৭৫৬-৯২৯ সাল
খিলাফত অব কর্ডোভা ৯২৯-১০৩১ সাল
ভলগা বুলগেরিয়া ৯২১-১২৪০ সাল
আমিরাত অব ক্রিট ৮২০-৯৬১ সাল
আমিরাত অব সিসিলি ৮৩১-১০৯১ সাল
ইমারাত অব বারি ৮৪৭-৮৭১ সাল
আমিরাত অব গ্রানাডা ১২৩০-১৪৯২ সাল
গোল্ডেন হোর্ড ১৩১৩-১৫০২ সাল
খাতানা অব খাজান ১৪৩৮-১৫৫২ সাল
ক্রিমিয়ান খানাতে ১৪৪১-১৭৮৩ সাল
আষ্ট্রখান খানাতে ১৪৬৬-১৫৫৬ সাল
ককেশাসিয়ান ইমামাত ১৮২৮-১৮৫৯ সাল
আইডেল উরাল স্টেট (মাত্র ২৭ দিন) ১৯১৮ সাল
চেচেন রিপাবলিক অব ইস্কেরিয়া ১৯৯১-২০০০ সাল।

আল আন্দালুস

ভিসিগোথিক রাজ্যের রাজা রডেরিকের নির্যাতনের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতে মুসলিম সেনাপতি বীর তারিক ইবনে জিয়াদ ৭১১ সালে যে অভিযান পরিচালনা করেন, তাতে মুসলমানরা বিজিত হন। মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে স্পেনের আন্দালুসিয়া, গেলেসিয়া,পর্তুগাল, কাস্টিল, লিওন, আরাগন, সেভিলা, সেপ্টেমেনিয়া। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত হয় আল আন্দালুস বা আন্দালুসিয়া।

রাজনৈতিক পরিচিতির দিক থেকে এটি যথাক্রমে উমাইয়া খিলাফতের প্রদেশ ৭১১-৭৫০ সাল পর্যন্ত এ খিলাফতের প্রথম গভর্নর হন আবদ আল আজিজ ইবনে মুসা। তিনি রাজধানী হিসেবে সেভিলকে পছন্দ করেন। ৭১৭ সাল নাগাদ, উমাইয়ারা সেপ্টিমেনিয়াতে তাদের প্রথম অভিযান চালানোর জন্য গল আক্রমণ করেন। ৭১৯ সালের মধ্যে, বার্সেলোনা এবং নারবোনও অধিকার করে। দামেশক উমাইয়া খিলাফত ধ্বংসের পরেও আন্দালুসিয়া উমাইয়াদের শাসন চালু ছিল।

আমিরাত অব কর্ডোভা

আমিরাত অব কর্ডোভা ছিল ৭৫০-৯২৯ সাল পর্যন্ত, ৭৫৬ সালে প্রথম আবদুর রহমান নিজেকে আমিরাতে গভর্নর বা আমির ঘোষণা করেন তিনি ৭৮৮ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ছয় বছর আত্মগোপন থেকে আন্দালুসকে একত্র করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে প্রায় ২৫ বছর সময় দিয়ে টলেডো, জারাগোজা, পেমপ্লোনা, বার্সেলোনাকে একত্রিত করতে সক্ষম হন। আমিরাত অব কর্ডোভা একশত পঞ্চাশ বছর তার বংশধররা শাসন করেন। আন্দালুসের বাহিরেও ছিল তাদের আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমের কিছু অংশের ওপর তাদের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ছিল। খ্রিষ্টান সীমান্তগুলোতে সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। খ্রিষ্টানদের চৌমুখী চক্রান্ত ও আমিরদের প্রতিযোগিতার ফলে নিয়ন্ত্রণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, আমির আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ক্ষমতা খোদ কর্ডোবার বাইরে বিস্তৃত ছিল না।

প্রথম আবদুর রহমানের পরিচয়

প্রথম আবদুর রহমান ছিলেন একজন উমাইয়া রাজপুত্র। তিনি উমাইয়া বংশের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র ছিলেন। স্পেনের ইতিহাসে তিনি 'আদ্-দাখিল' নামে পরিচিত। 'আদ্-দাখিল' শব্দের অর্থ প্রবেশকারী বা সূচনাকারী। তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের সূচনা করায় অথবা পরাধীন উমাইয়া আমিরাত থেকে তিনি স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের সূচনা করায় তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়।

প্রিয় পাঠক পরবর্তী পর্বে থাকবে ইউরোপে মুসলমানদের সোনালী যুগের ইতিহাস

লেখক : সভাপতি, পর্তুগাল মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষ্যে

মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতির আহ্বান

বিষয় : এমসিএ সেন্ট্রাল রামাদ্বান ২০২৫ তহবিল সংগ্রহ (২৮/০২/২০২৫, রামাদ্বানের প্রথম দিন থেকে)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আশা করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহে, আপনারা ঈমান ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে উত্তম অবস্থায় আছেন। একইসাথে, আপনি আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন এবং ব্যক্তিগত ইবাদতের প্রতিও মনোনিবেশ করছেন বলে প্রত্যাশা করি।

আসন্ন রামাদ্বান মাসের তিনটি লঞ্চগুড তহবিল সংগ্রহ ইভেন্টের লক্ষ্যসমূহ :

১.এমসিএ অনুমোদিত তিনটি প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

২.দাওয়াতি কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা।

৩.এমসিএ এবং এই সংগঠনের মহৎ কাজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আমরা এমসিএ সেন্ট্রাল লঞ্চগুড তহবিল সংগ্রহ ইভেন্টগুলোকে নিম্নোক্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে রামাদ্বানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

- ৪ বা ৬ মার্চ ২০২৫ : রামাদ্বানের প্রথম দশকে মুসলিমাত ইউকের তহবিল সংগ্রহ (মঙ্গলবার বা বৃহস্পতিবার)।
- ১৬ মার্চ : রামাদ্বানের দ্বিতীয় দশকে জেএমসি এন্ড ইয়ুথের তহবিল সংগ্রহ (রবিবার)।
- ২১ মার্চ : রামাদ্বানের তৃতীয় দশকে নন-মুসলিম দাওয়াহ'র অর্থসংগ্রহ (শুক্রবার)।

অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটো অপশন বা প্রক্রিয়া রয়েছে :

- অপশন ১ : রামাদ্বান রেফারেলস এর আওতায় প্রতিদিন কমপক্ষে ১ পাউন্ড, ২ পাউন্ড বা ৩ পাউন্ড করে রামাদ্বানের ৩০ দিনই দান করা যায়।
- অপশন ২ : দৈনিক প্রতিযোগিতা– প্রতিদিন মাত্র ১ পাউন্ড করে (২৪ ঘণ্টার ক্যাম্পেইন) এমসিএ-এর তিনটি ক্যাম্পেইনের জন্য। মাত্র তিন দিন।

লঞ্চগুড-এর রামাদ্বান রেফারেল প্রোগ্রাম (অপশন ১) :

এমসিএ-এর একজন সদস্য, সহযোগী সদস্য, সমর্থক এবং বন্ধু-বান্ধব এমসিএ'র তহবিল সংগ্রহ কোডের অধীনে নিবন্ধন করবেন এবং রামাদ্বানের ৩০ দিনের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১ পাউন্ড, বা ২ পাউন্ড বা ৩ পাউন্ড দান করবেন। তারা লঞ্চগুড বা এলজির-এর তালিকাভুক্ত বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় দান করবেন। প্রতিদিন ৩ পাউন্ড দান করলে যদিও ৩০ দিনে ৯০ পাউন্ড পাওয়ার কথা কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় এমসিএ রামাদ্বান শেষে এলজি থেকে ১০০ পাউন্ড পাবে। এ কারণে এমসিএকে যদি আমরা মাস শেষে ১০০ পাউন্ড প্রদান করতে চাই তাহলে আনুপাতিক হিসেবে একজন ব্যক্তিকে রামাদ্বান শুরুর আগেই এলজির সাথে তিনি যে পরিমাণে দান করবেন (১ পাউন্ড, ২ পাউন্ড বা ৩ পাউন্ড)- সেই আলোকে নিবন্ধন করতে হবে।

এলজি প্রথম দিনের ডোনেশন এমসিএ-এর অ্যাকাউন্টে জমা করবে। আলহামদুলিল্লাহ, এমসিএ-এর অনেক সদস্য আছে, তাই আমরা অন্তত এই এলজি রেফারেল প্রোগ্রামের জন্য সকলেই নিবন্ধন করতে পারি। এটি এই রামাদ্বানেএমসিএ সদস্যদের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প এবং আমাদেরকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে ইনশা আল্লাহ।

এই তহবিল সংগ্রহ মাস থেকে প্রাপ্ত আয় ইতোমধ্যে আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আমরা অন্তত ১৫০,০০০ পাউন্ড সংগ্রহের বাজেট করেছি ইনশা আল্লাহ। এই তহবিল সংগ্রহের মূল লক্ষ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে দাওয়াহ প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করা এবং এমসিএ-এর মহৎ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে

সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আমি আমাদের সকল ভাই ও বোনদের অনুরোধ করছি যে, তারা যেন প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে এই মহৎ কাজে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাদের নাম, ইমেইল ঠিকানা এবং পৃথক পেমেন্ট কার্ডের বিস্তারিত যোগ করে এই তিনটি ক্যাম্পেইন চলাকালে কমপক্ষে ১ পাউন্ড অনুদান দিতে উৎসাহিত করেন। আপনারা অনুগ্রহ করে এই তহবিল সংগ্রহের লিংকটি ব্যাপকভাবে শেয়ার করুন এবং অন্যদেরও এতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। আমাদের লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ সংখ্যক দাতা সংগ্রহ করা যাতে আমরা ইনশা আল্লাহ প্রথম পুরস্কার জিতে নিতে পারি।

এটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর, বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং ইসলাম প্রচারের একটি চমৎকার সুযোগ। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহর পথে দান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে আমরা 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে দান) এর অনন্য সুযোগ তৈরি করছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন– "আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।" (সুরা বাকারা: ১৯৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রতিটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।" (সুরা বাকারা : ২৬১)

তাই আসুন, এই নেক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করি এবং যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই আহ্বান পৌঁছে দেই। প্রতিটি সদস্য/সদস্যাকে কমপক্ষে ১ পাউন্ড দান বা সংগ্রহ করার এবং আরও অন্তত ৫ জন ব্যক্তিকে একইভাবে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করছি। এক পাউন্ড করে দানের তিনটি প্রতিযোগিতা পৃথক তিনটি দিনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি প্রতিযোগিতার সময় ঘনিয়ে আসা মাত্রই আমরা অর্থ সংগ্রহ করার সেই ইভেন্টগুলোর লিংক আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেবো ইনশা আল্লাহ।

এলজি রেফারেল প্রোগ্রাম (অপশন ১) এর জন্য প্রক্রিয়া :

(ক) এমসিএ ফান্ডরাইজাররা তাদের ক্যাম্পেইন পেইজের 'রামাদ্বান' ট্যাব থেকে একটি অনন্য রেফারেল কোড তৈরি করবেন।

(খ) ফান্ডরেইজারেরা তাদের রেফারেল কোড লিংকটি টার্গেটকৃত দাতাদের সাথে শেয়ার করবেন।

(গ) দাতারা রামাদ্বান শুরুর আগেই রেফারেল কোড ব্যবহার করে রামাদ্বান চ্যালেঞ্জের জন্য নিবন্ধন করবেন এবং প্রতিদিন ১ পাউন্ড, ২ পাউন্ড বা ৩ পাউন্ড দান করবেন (রামাদানের ৩০ দিনের প্রতিটি দিন)।

(ঘ) প্রতিটি নিবন্ধিত দাতার জন্য ফান্ডরেইজারেরা (তহবিল সংগ্রহকারীরা) অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করবেন।

প্রতিযোগিতা শুরু হবে প্রতিটি ইভেন্টের দিন রাত ১২:০০ টায় এবং শেষ হবে পরদিন রাত ১২:০০ টায় (২৪ ঘণ্টার চ্যালেঞ্জ)।

এর বাইরেও আপনাদের আরও তথ্য জানার প্রয়োজন হলে এমসিএ'র সেন্ট্রাল ফাইনান্স সেক্রেটারি মুশতাক আহমেদ ভাই অথবা সিএফডি মেম্বার মনিরুজ্জামান হাজরা ভাইয়ের সাথে ০৭৫৯৫ ৬৫৯ ৯৩৭ নাম্বারে অথবা হাসানুল বান্না ভাইয়ের সাথে ০৭৮৯৪ ২১২ ২৫৮ নাম্বারে যোগাযোগ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

আল্লাহ তাআলা এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার তাওফিক দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সব নেক প্রয়াস কবুল করুন এবং এর উত্তম প্রতিদান আমাদেরকে দান করুন। আমিন।

আপনাদেরই দ্বীনি ভাই
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
কেন্দ্রীয় সভাপতি
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)

সংগঠন সংবাদ

এমসিএ'র কুরআন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

কুরআন শিখুন, কুরআন পড়ুন, কুরআনের আলোকে চিন্তা করুন, কুরআন অনুভব করুন, কুরআন বুঝুন এবং কুরআন অনুসরণ করুন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের জ্যোতিতে আলোকিত হওয়ার এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হল কুরআন কনফারেন্স ২০২৫।

রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) ইস্ট লন্ডনের মে-ফেয়ার হলে অনুষ্ঠিত মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের (এমসিএ) কুরআন কনফারেন্স ছিল খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। বাবা-মা'র সাথে শিশু-কিশোর-সহ অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ।

প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমসিএ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি খ্যাতিমান আইনজীবী ও মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইমাম আব্দুল্লাহ আল মওদুদ। অতিথি আলোচক ছিলেন শায়েখ ইমাম খিজির হোসাইন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিশরীয় ক্বারী শায়েখ আব্দুর রহমান ফারাজ হাফিজাহুল্লাহর প্রশান্তিময় তিলাওয়াত অনুষ্ঠানে মুগ্ধতা ছড়ায়। আলোচনা পর্বে তার বক্তব্যও ছিল খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের শায়েখ আব্দুর রহমানের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের অনুবাদ করেন হাফিজ তামজিদ আল কাদির।

তরুণদের পর্বে তিলাওয়াত করেন ক্বারী মোহাম্মদ রাকিব আনজুম (কিউ ফ্যাক্টর ৮ টিন গ্রুপ বিজয়ী), মুহাম্মদ হুজাইফা বিন কাদির (কিউ ফ্যাক্টর ৮ জুনিয়র গ্রুপ বিজয়ী)। তরুণদের পর্বে তিলাওয়াতের অনুবাদ করেন আব্দুল্লাহ আহমদ ও আব্দুর রহমান সা'দ। তারপর কুরআন তিলাওয়াত ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন মরিয়ম ফাতিমা জাজিম (কিউ ফ্যাক্টর ৮ জুনিয়র গ্রুপ বিজয়ী)।

ব্যতিক্রমী আয়োজন ছিল প্যানেল ডিসকাশন। শিক্ষক হাসান কাওসারের পরিচালনায় 'মাই জার্নি টু কানেকটিং কুরআন' বিষয়ে প্যানেল ডিসকাশনে আরো ছিলেন ইমাম আব্দুল্লাহ আল মওদুদ, ক্বারী ইয়াহয়া আলী, টেকনোলজি কনসালটেন্টস মহসিন হামিদ ওতমান।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি নুরুল মতিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন এমসিএ'র কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সেক্রেটারি ডা. এএসএম আশরাফ মাহমুদ উজ্জল।

অ্যালবাম

কুরআন সম্মেলনে আগত অতিথি ও শিশুদের ইসলামি সংগীত পরিবেশন

অ্যালবাম

এমসিএ ইস্ট লন্ডনের রিজিয়নের উদ্যোগে দাওয়াতি স্টল

লন্ডন সাউথ ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে উইন্টার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত।

অ্যালবাম

ইসলামি বক্তিতা প্রতিযোগীতা।

অ্যালবাম

এমসিএ ইস্ট সাউথ রিজিয়নের উদ্যোগে রামাদ্বান বিষয়ক নাইট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত।

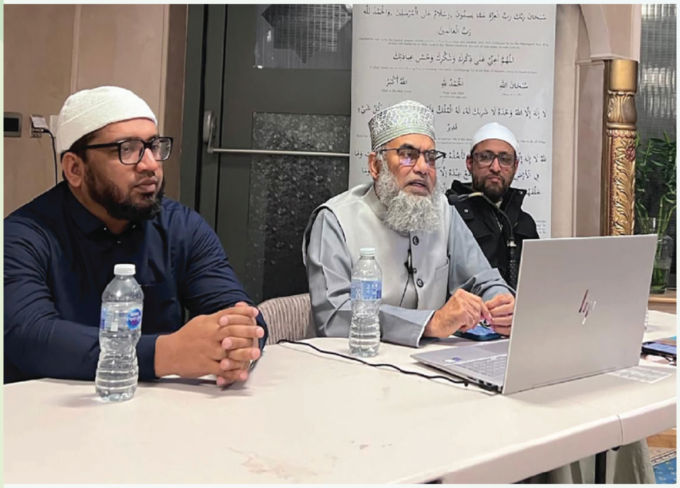

সিরাতুন নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
QUR'AN CONFERENCE 2025
Read Quran, Love Quran, Follow Quran
GUEST SPEAKERS AND QARI:
Qari Sheikh Abdur Rahman Farag
World Renown Qari, Egypt
Barrister Hamid Hossain Azad
Central President, MCA
Sheikh Abdur Rahman
Imam, East London Mosque
Ajmal Masoor
Imam, Media Personality
Shiekh Khidir Hossain
Imam, Aysha Mosque
Yahya Ali
Young Qari
Mohseen Hamid Othman
Technology Consultant at Accenture
Hafiz Mijanul Islam
Renown Qari
(Q Factor 7, Runner up, 2nd)
Maryam Fatimah Jazeem
Young Qari
(Q factor 8, Winner 1st)
Yahya Shoieb
Young Qari
(Q factor 8, Runner Up 2nd)
Muhammed Huzaifa Bin Kadir
Young Qari
(Q factor 8, Runner up, 3rd)
YOU ARE INVITED WITH YOUR FAMILY
DATE:
16 February
Sunday, 2025
10:00am - 12:45 pm
VENUE:
Mayfair Venue,
1078-1082, High Road,
Romford RM6 4BD
PLEASE REGISTER
Link: https://tinyurl.com/qf2025
QR code:
FREE EVENT
For information:
Mobile: 07946641070
Email: events@mcasite.org

আলোরপথ
কুরআন ভিত্তিক পরিবার গঠন
কুরআনের আলোকে রামাদ্বান
রামাদ্বান মাসে কিয়ামুল লাইল-এর ফজিলত